পাখির মা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৪

মুদ্রাকর :
তারকনাথ হাজরা
দি করুণাময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৬/১, রাধামাধব সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সুবোধ রায়

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

পরদেশী

আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে

নীললোহিতের চোখের সামনে

আমার প্রেমের কবিতা

সেই সময়

ময়ূর পাহাড়

পূর্ব পশ্চিম, ইত্যাদি

নারী

সুজাতার সেই হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিন সারা দুপুর প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল, আমি ভেবেছিলুম, সন্ধের আগে থামবে না, বাড়ি ফেরার ব্যাপারে খুব সমস্যা হবে। কিন্তু বিকেল চারটের মধ্যেই হঠাৎ সেই বৃষ্টি যেন উড়ে চলে গেল অন্য দেশে, দিব্যি ঝিকিমিকি রোদ উঠে গেল। জানলা দিয়ে দেখলুম, কলেজ স্ট্রিটে এক হাঁটু জল জমে গেছে।

রোদ্দুরের একটা শিখা এসে পড়েছে সুজাতার মুখে। আমি তাকে বললুম, তোমার চেয়ারটা একটু এদিকে সরিয়ে আনো।

চেয়ার না সরিয়ে সুজাতা উঠে দাঁড়ালো। তারপর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললো, আমি এবার বাড়ি যাবো।

আমি রীতিমতন অবাক হয়ে বললুম, এখন বাড়ি যাবে কী করে? বসো, আমি তোমায় পৌঁছে দেবো।

সুজাতা মৃদু গলায় বললো, না, আমি একাই যেতে পারবো।

কোনো মানুষ যদি হঠাৎ কখনো তার স্বভাবের সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের ব্যবহার করে, তা হলে তাকে বলার মতন কোনো কথা চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুজাতার পরিচ্ছন্নতার বাতিক। একদিন তার চটিতে কুকুরের গু লেগে গিয়েছিল বলে সে চটিটাই ফেলে দিয়েছিল, সেই চটি আবার ধুয়ে ব্যবহার করার কথা যেন সে চিন্তাই করতে পারে না। সে এ রকম নোংরা জল কাদার মধ্য দিয়ে হাঁটবে? গত বছর এই রকম একটি দিনে সে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, জল কমে যাবার জন্য।

তাছাড়া হঠাৎ তার কী হলো, সে একা চলে চলে যেতে চাইছে কেন?

সুজাতা নামতে লাগলো কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে। আমি তার পেছন পেছন এসে বললুম, এই, তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নাকি?

সুজাতা কোনো উত্তর দিল না।

জলের মধ্যে অবলীলাক্রমে পা দিয়ে সে এগিয়ে গেল ট্রাম লাইনের দিকে। আমি তখনও কিছুই বুঝতে পারছি না। সুজাতার সঙ্গে আমার রাগারাগি হয়নি। একটাও কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি। শুধু শেষ পাঁচ মিনিট আমরা দু-জনেই চুপ করে ছিলুম। এমন তো প্রায়ই হয়, কথা থেমে যায়, কিন্তু চিন্তার তরঙ্গ পরস্পরকে ছোঁয়।

আমি সুজাতার হাত ধরে বললুম, কী পাগলামি করছো? তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনছি!

সুজাতা হাতটা ছাড়িয়ে নিল, শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললো, আমি একলা যাবো, তুমি আমার সঙ্গে এসো না!

সুজাতার রাগ আমি চিনি। অভিমানও চিনি। আমি আবার সুজাতার হাত ধরতে যেতেই সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে স্থির ভাবে তাকালো। সেই মুখ আমার সম্পূর্ণ অচেনা। এই সুজাতা আমার সঙ্গে যাবে না। আমার সঙ্গে সে কথা কাটাকাটিও করবে না, সে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগলো সুজাতা। একটা চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরা, মাথার খোঁপাটা একটু-খানি ভেঙে গেছে। কাপড় বাঁচাবার একটুও চেষ্টা করছে না সে। পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে জল ছিটিয়ে, সেদিকেও তার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। সুজাতার সেই কথার মধ্যে একটা তীব্র আঘাত ছিল। কোনোদিন সে আমার সঙ্গে ঐ সুরে কথা বলেনি। তা ছাড়া কেনই বা সে হঠাৎ এমনভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে? আমি কী ভুল বলেছি, কী দোষ করেছি?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

বৃষ্টি থামার পর অনেক লোকই একসঙ্গে রাস্তায় নেমে এসেছে। চতুর্দিকে নানা রকম গাড়ির হর্ন। কিন্তু আমি যেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত রাস্তাটা শূন্য। সেখানে শুধু রয়েছে একমাত্র সুজাতা। কোনোদিন সে রাস্তার জল কাদায় নামেনি, আজ সে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ভিজিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সে একবারও তাকাচ্ছে না পেছন ফিরে। যেন আমার আর কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে।

মোড়ের মাথায় পৌঁছোবার আগেই একটা সাদা রঙের গাড়ি থামলো তার পাশে। দরজাটা খুলে গেল, কে যেন ডাকলো তাকে। সামান্য একটু দ্বিধা করে সুজাতা উঠে পড়লো সেই গাড়িতে, এবারেও সে তাকালো না আমার দিকে। আমাব মনে হলো, ঐ গাড়িটা যেন সুজাতাকে গ্রাস করে নিরুদ্দেশে নিয়ে চলে গেল!

॥ ২ ॥

সুজাতাকে আমি অল্প বয়েসে দেখেছি। কিন্তু তাকে আমি অল্প বয়েস থেকে চিনি না। তখন আমার বয়েস চোদ্দ কি পনেরো হবে, বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে গিয়েছিলুম আগ্রায়। টুণ্ডলা জংশনে আমার মেজমামা স্টেশন মাস্টার ছিলেন, তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

তখন আমার সদ্য গলা ভাঙছে, হাফ প্যান্ট পরলে পা দুটো বড্ড লম্বা লম্বা মনে হয়। গালে সব সময় দুটো তিনটে ব্রণ থাকে বলে লজ্জা-লজ্জা করে। সেই বয়েসেই বাবা-মায়েদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমার খারাপ লাগতে শুরু করেছিল। মুখখানা সব সময় গোঁজ হয়ে থাকতো।

তাজমহল দেখতে গিয়ে একগাদা বাঙালীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অকটোবর-নভেম্বরে বাঙালীরা দলে দলে ভারত অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। তাজমহল দেখেনি এ রকম মধ্যবিত্ত বাঙালী বিরল. এবং

অনেক বাঙালীই সেখানে গিয়ে গদগদভাবে, 'একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান···' আবৃত্তি করতে শুরু করে। আমরা একবার দিনের বেলা তাজমহল দেখতে যাই, একবার রাত্তিরে। এ রকমই নিয়ম। প্রত্যেকবারই নাকি তাজমহলকে নতুন মনে হয়। আমার অবশ্য তাজমহল দেখে এমন কিছু আহামরি লাগে নি, সেই বয়েসটাই বোধহয় ঐসব দেখে মুগ্ধ হবার কথাও নয়।

অন্য বাঙালীদের মধ্যে আমার মায়ের এক বান্ধবীকে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল। সেই ভদ্রমহিলা আবার তাঁদের পাড়ার তিন-চারটি পরিবারের সঙ্গে একটা দল মিলে এসেছেন। বিরাট এক দঙ্গল। সেই দঙ্গলের মধ্যে ছিল সুজাতা। তার তখন ঠিক বারো বছর বয়েস! সেই বয়েসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বাবা-মায়েরা আলাপ করিয়ে দেয় না, তারা নিজেরাই ভাব করে নেয়।

সুজাতার সঙ্গে আমি দু'একটা কথা বলেছিলাম বোধহয়। আমার ঠিক মনে নেই। তখনও মেয়েদের সম্পর্কে আমার তেমন কোনো আগ্রহ জাগেনি। পূর্ণ বয়স্কা মহিলা, বিশেষত যাদের স্বাস্থ্য ভালো, যাদের বলা যায় সম্পূর্ণ নারী, তাদের শরীর ও মুখের লাবণ্যের দিকে ভীরু ভীরু চোখে তাকাতে ইচ্ছে করতো বটে, কিন্তু নিজের চেয়ে কম বয়েসী মেয়েদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাবই ছিল।

সে রাতটা ছিল পূর্ণিমার রাত। প্রায় সবাই সঙ্গে করে নানা রকম খাবার নিয়ে গিয়েছিল। তাজমহল দেখার নামে আসলে সামনের বাগানে চাঁদের আলোয় পিকনিক।

সব পরিবারের খাবার-দাবারগুলো মিশিয়ে নানা রকম খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল, হঠাৎ একটা রব উঠলো, একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ ধরে সেই মেয়েটিকে কেউ দেখেনি।

সেই মেয়েটিই সুজাতা।

পুরুষরা সবাই খুঁজতে গেল। তাতে আমারও উৎসাহ ছিল, তাতে নিজেকেও পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা ছাড়া এ যেন চোর চোর খেলার মজা।

শেষ পর্যন্ত সুজাতাকে খুজে পাওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়। হয়তো তেমন মন দিয়ে খুঁজিনি, কারণ মেয়েটিকে তো আমি চিনতামই না ভালো করে। তবে ছুটোছুটি করেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

মেয়েদের স্মৃতিশক্তি কি বেশি? সুজাতা কিন্তু ঠিক মনে রেখেছিল। সেদিন সেই বাঙালীদের দলটায় নানা বয়েসের ছেলে ও পুরুষ ছিল, তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে শুধু আমাকেই কি মনে রেখেছিল সুজাতা? না, সকলকেই তার মনে আছে? আমি তো সেদিন কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিই নি!

এর বেশ কয়েক বছর পর, সুজাতার সঙ্গে একদিন গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, আকাশে একটা কমলালেবু রঙের চাঁদ দেখে সুজাতা বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল তাজমহলের সামনে!

আমাকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে সুজাতা আবার বলেছিল, হাফপ্যান্ট-পরা বয়েসে তুমি একবার আগ্রায় যাওনি? সেবারে আমরাও ছিলুম ওখানে।

সুজাতা যতই মনে করাবার চেষ্টা করে, আমার কিছুতেই মনে পড়ে না। একটি মেমসাহেবকে প্রায় তার বাপের বয়েসী একজন সাহেব একটা গম্বুজের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল, আমি দেখে ফেলেছিলুম, তাজমহল সম্পর্কে সেটাই আমার প্রধান স্মৃতি। আর দ্বিতীয় স্মৃতি সন্ধ্যায় আজানের মধুর সুর।

সুজাতা বললো, একটা মেয়ে সেবার হারিয়ে গিয়েছিল, তোমার তাও মনে নেই?

হ্যাঁ, সেই ঘটনাটা মনে আছে বটে, কিন্তু কিশোরী মেয়েটির মুখ তো মনে করতে পারি না।

সুজাতা বললো, তুমি কেন আমাকে খুঁজতে যাওনি?

তুমি কি সেই জন্যই হারিয়ে গিয়েছিলে নাকি? আমি তোমায় খুঁজে বার করবো বলে?

মোটেই না। তাজমহলের সামনে সবাই এত এত খাবার খাচ্ছিল, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছিল, সেটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তাই আমি ছুটে চলে গিয়েছিলুম, তাজমহলের পেছন দিকে, নদী খুঁজতে।

পেয়েছিলে সেই নদী?

হ্যাঁ। জলের ধারে একা একা বসে থাকতে খুব ভালো লাগছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, আমাকে যেন আর কেউ কখনো ডাকতে না আসে। আমি ঐখানেই থাকবো।

আমার তুলনায় সেই বয়েসেই সুজাতা অনেক বেশি পরিণত ছিল। আমি তাজমহলের দৃশ্য উপভোগ করিনি, নদীর কথা আমার মনেও পড়েনি। আর সুজাতা একা একা গিয়ে বসেছিল যমুনার তীরে।

॥ ৩ ॥

কেন সুজাতা রাস্তার জল ভেঙে একা একা চলে গেল?

তার ঠিক দু-দিন আগেই আমার এম এ পরীক্ষা শেষ হয়েছিল। হাতে অফুরন্ত অবসর। কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করেছিল উটি যাবে, টানাটানি করছিল আমাকে নিয়েও! কিন্তু সুজাতা সেটা চায়নি। সে চেয়েছিল, আমার সঙ্গে পুরীতে যেতে।

হ্যাঁ, আর কেউ থাকবে না, শুধু আমার সঙ্গে সে পুরীতে যাবে, এক হোটেলে থাকবে। এসব কথা সুজাতা নিঃসঙ্কোচভাবে বলে। সে বাড়ির অভিভাবকদের ভয় পায় না।

প্রথমে একটু চমকে উঠেছিলুম ঠিকই। চাকরি-টাকরি পাবার আগে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের বাড়ির অবস্থা ভালো না, টানাটানির সংসার। বিয়ের আগেই বান্ধবীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে থাকা, ইংরিজি উপন্যাসেই এরকম হয়। যদিও আমরা ইংরিজি উপন্যাসের জগতেই অনেকটা বাস করি, তবু মধ্যবিত্ত

বাঙালী সংস্কার একেবারে যায় না, কোথাও একটু ভয় ভয় করে। যদি চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

আমাকে একটু ইতস্তত করতে দেখে সুজাতা খানিকটা বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলো, আমার সঙ্গে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছো? বন্ধুদের সঙ্গে যাওয়াটাই তোমার বেশি পছন্দ? তা হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে উটিতে যাবো!

আমি অমনি কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে, চোখে একটা হাসির ঝিলিক দিয়ে বললুম, পাগল! বন্ধুদের সঙ্গে কে যাবে! শুধু তুমি আর আমি, পুরীর হোটেলে সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখবো, আর······দারুণ, দারুণ, কবে যাবে বলো!

বন্ধুদের সঙ্গে উটি যাবার বদলে সুজাতার সঙ্গে পুরী যেতে আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো সুজাতার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। শুধু টাকা-পয়সার চিন্তাটা মনের মধ্যে একটু খচখচ করছিল। আজেবাজে হোটেলে তো থাকতে পারবে না সুজাতা। আমার নিজস্ব কোনো জমানো টাকা ছিল না, বাবা-মায়ের কাছে দু-তিনশো টাকার বেশি চাওয়া যায় না। তবু হাজারখানেক টাকা কোনো না কোনো উপায়ে যোগাড় হয়ে যেতই! আমার ঐ অর্থ-চিন্তা কি মুখে ফুটে উঠেছিল?

সে কি ভেবেছিল, আসলে তাকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে যাবার সাহস আমার নেই? আমার কিছুক্ষণ নীরবতার সে ভুল অর্থ করেছিল?

এত সামান্য কারণে সুজাতা রাগ করে চলে যাবে? আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কঠিন গলায় বললো, তুমি আমার সঙ্গে এসো না!

॥ ৪ ॥

সুজাতাদের বাড়ি এলগিন রোডে। কলকাতার অধিকাংশ বাঙালী বড়লোকদের মতন ওদের পরিবারেরও তখন পড়ন্ত দশা।

অত বড় বাড়িটা অনেকদিন সারানো হয়নি। কিছুটা অংশ ভাড়াটে বসে গেছে। ওদের উঠোনটায় হয়েছে গাড়ি সারাবার গ্যারাজ। মাড়োয়াড়ী ও গুজরাতি ব্যবসায়ীরা বাড়িটা কিনে নেওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে।

তবু সুজাতার বাবা-কাকাদের মুখে একটা অহংকারি ভাব। লোকের সঙ্গে কথা বলে ভুরু তুলে। সুজাতার বড়দা সিনেমা কোম্পানি খুলে প্রচুর টাকা খোয়ালো। কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র হা-হুতাশ করেনি। এমন ভাব দেখায় যেন দু-পাঁচ লাখ টাকা কিছুই না।

সুজাতার ছোড়দার নাম মন্তাদা, ক্রিকেট খেলা নিয়ে পাগল। একবার রঞ্জি ট্রফিতে চান্স পেয়েছিল, দু' ইনিংসে মোট রান এগারো। তবু মুখে কি গর্বিত ভাব! আমার দিকে এমন ভাবে তাকায়, যেন আমি একটা কানা-খোঁড়া-পঙ্গু। কিংবা বামন। তার কারণ আমার জামা-কাপড়ের চাকচিক্য ছিল না, আমার কোনো উঁচু বংশ পরিচয় ছিল না। আমি কথায় কথায় বলতে পারি না যে বার্ড কোম্পানীর ম্যানেজার আমার মামা কিংবা অমুক নাম করা ব্যারিষ্টার আমার মেসোমশাই! সুজাতার মতন মেয়ে যে আমাকে বাড়িতে ডাকে, সেটা যেন তার দয়া!

কিছুদিন আগে সুজাতার মা মারা গেছেন, সুজাতা বলতো, এই পৃথিবীতে মাকে ছাড়া আর কারুকে সে কখনো গ্রাহ্য করেনি। সুজাতার বাবা রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিলেন, মেয়ের প্রতি মনোযোগ দেবার তাঁর সময় নেই। সুজাতা একদিন ওদের বাড়িতে আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ওদের বাড়ির আর কারুর সঙ্গে সেদিন একটা কথাও হলো না আমার। আমি গিয়ে বসলুম তেতলায় সুজাতার নিজস্ব ঘরে, কিছুক্ষণ গল্প করার পর সুজাতা সেই ঘরেই খাবার নিয়ে এলো, আমাদের বাড়িতে এই রকমটা চিন্তাও করা যায় না। বন্ধু-বান্ধবদের খেতে বললে মা নিজে খাবার পরিবেশন করেন। সুজাতার মা বেঁচে নেই বলে আর কেউ এ বাড়িতে

ভ্রূক্ষেপই করলো না যে, তিনতলার ঘরে ঐ যুবতীটি কার সঙ্গে অত গল্প করছে।

অন্য কেউ যদি বিরক্ত করতে না-ই আসে, তাহলে সুজাতাকে চুমু না খাওয়ারও কোনো মানে হয় না! আমি সুজাতাকে একবার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখটা ফেরাতেই সুজাতা আমার ঠোঁটে একটা হাত চাপা দিয়ে বললো, এখনো সময় হয়নি।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বলেছিলুম, তার মানে?

সুজাতা পাতলাভাবে হেসে বলেছিল, তার মানে সময় হয়নি!

সুজাতার মতন মেয়েকে জোর করে চুমু খাওয়া যায় না।

শরীরের ব্যাপারে সুজাতার সে রকম কিছু শুচিবাই ছিল না। ও হঠাৎ হঠাৎ আমার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতো। আমি কখনো ওকে জড়িয়ে ধরলে ও আপত্তি জানাতো না। আমরা কোলাঘাট কিংবা ব্যারাকপুর গেছি ট্রেনে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে। কিন্তু চুমু পর্যন্ত পৌঁছোনো হয়নি।

সুজাতা আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, এখনো সময় আসে নি। তার মানে, সময় আসবে, তখন ও নিজেই জানাবে। সেইজন্যই কি ও আমার সঙ্গে পুরীতে যাবার কথা তুলেছিল। দু'জনে হোটেলের এক বিছানায়······।

আমি ছাড়াও সুজাতার আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। অনন্য, গৌতম, অনির্বাণ। ওদের সঙ্গেও সাবলীলভাবে মিশতো সুজাতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন বাংলার অধ্যাপক নাকি সুজাতার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল, সেই অধ্যাপকটিকে নিয়ে আবার হাসাহাসি করতুম আমরা সবাই। সেই ভদ্দরলোক সুজাতাকে নিয়ে চার-পাঁচটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। তার মধ্যে একটা কবিতা এখন আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে ফেরে।

সুজাতার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আমার তফাৎ ছিল এই যে, সুজাতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে কখনো বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয়নি। একদিন দেখা হলেই ঠিক হয়ে যেত, পরে আবার কখন কোথায় দেখা

হবে। একবার হঠাৎ খুব কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় আমি সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, রাত সাড়ে আটটায় সুজাতা আমার হস্টেলে চলে এসেছিল। একদল ছেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও জিজ্ঞেস করেছিল, অনীশ কোথায় ?

অনীশের কী হয়েছে ?

আমি ঠিক জানতুম, সুজাতা আসবে।

কিন্তু আমি আজও বুঝতে পারি না সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতা কেন অমনভাবে চলে গেল। পরের বার কোথায় দেখা হবে তা কিছুই বললো না।

সুজাতার বাড়িতে গিয়ে এর পর আমারই কি খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল যে সুজাতা কেন রাগ করেছে ? রাগের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দু'দিন পরেই সুজাতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল অবশ্য। সুজাতার সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে ছিল। তাদেরও আমি চিনি। সুজাতা আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়নি। আগের দিনের ব্যবহারের কোনো কৈফিয়ৎ ও দেয়নি। স্বাভাবিক হাসি মুখে বলেছিল, অনীশ, তোমার দুটো বই আছে আমার কাছে। আর তোমার একটা কলমও আমি একদিন ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলুম, দীপার হাত দিয়ে ফেরৎ দিয়ে দেবো, তা হলেই তুমি পেয়ে যাবে তো ?

সুজাতা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন আমি অনীশ নয়, অনন্য, গৌতম, অনির্বাণ কিংবা অন্য যে-কেউ।

এরপর পোষা কুকুর ছাড়া আর কারুর কি ঐ মেয়েকে অনুসরণ করা উচিত ?

সুজাতার ঐ অদ্ভুত ব্যবহারে আমার অভিমান কিংবা দুঃখ হয়নি, সর্বাঙ্গ জ্বলে গিয়েছিল অসম্ভব রাগে। যেসব রাগী ছেলেরা অহংকারী প্রেমিকার মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারে, তাঁদের মনস্তত্ত্ব যেন বুঝতে পারছিলুম অনেকটা। কিন্তু আমি তো অত নীচে নামতে পারি না ! আমি শুধু মনে মনে সুজাতাকে বলেছিলুম, বিদায় !

তবু আমার আশা ছিল, সুজাতা দু' চারদিনের মধ্যেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে, ও নিজেই আমার কাছে আসবে কিংবা চিঠি লিখবে।

পরে একদিন দেখা হলো. সুজাতা আর আমার সঙ্গে ভদ্রতা করেও কোনো কথা বললো না। যেন সব কথা শেষ হয়ে গেছে!

অনন্য, গৌতম, অনির্বাণদের চেয়েও সুজাতা যে আমাকে কেন বেশি পছন্দ করতো, তার কারণটা বোঝাও শক্ত। ওদের সঙ্গেই সুজাতাদের পারিবারিক মিল বেশি। তবু সুজাতা বেছে নিয়েছিল আমাকে, সুজাতার সারল্য ও পবিত্রতার সংস্পর্শে আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলুম, আমি নিজেকে সুজাতার যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছিলুম। সুজাতার তুলনায় অন্য সব চেনা মেয়েদেরই মনে হতো তুচ্ছ।

যে-সুজাতা প্রায়ই নিজে থেকে আমার হাতটা নিয়ে খেলা করতো, সেই সুজাতা অকারণে আমার হাত জোর করে ছাড়িয়ে চলে গেল হঠাৎ?

সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতার মুখোমুখি টেবিলে বসে আমি চুপ করে ছিলুম মিনিট পাঁচেক। সেইটাই কি আমার দোষ হয়েছিল!

॥ ৫ ॥

দুর্গাপুরে চাকরি পাবার দু' বছর বাদে আমি বিয়ে করি পারমিতাকে।

তারপর সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই আমাদের একটি ছেলে ও মেয়ে জন্মালো। ব্যস, আর দরকার নেই। ছিমছাম, সুপরিকল্পিত পরিবার। পারমিতা একটা ছোট্ট অপারেশন করিয়ে নিল। সংসার চালাবার ব্যাপারে পারমিতার দক্ষতা অসাধারণ। তার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে নিছক গৃহিণী সে নয়। ছেলে-মেয়ে মানুষ করার নামে অনেক মেয়ে এমন ভাব দেখায় যেন বিরাট একটা স্বার্থত্যাগ করছে।

তাদের জীবনে আর কোনো আনন্দ-উপভোগ থাকে না, শুধু সন্তানই ধ্যান-জ্ঞান।

পারমিতা কিন্তু ছেলেমেয়েদের যে-টুকু-যত্ন করবার তা ঠিকই করে, তারপরেও সে প্রত্যেকটি গান-বাজনার আসরে যায়।

পারমিতার সঙ্গীতের নেশা। আধুনিক ফিল্ম বা সাহিত্যের সে মোটামুটি খবর রাখে।

পারমিতার গানের গলাটাও বেশ সুরেলা।

পারমিতার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্কে কোনো খাদ ছিল না। যদিও আমার প্রায়ই মনে হতো, বিয়ে না করে পারমিতা গানের জগতে লেগে থাকলে নাম করতে পারতো। বিয়ে করে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাঙালী মেয়েরা আর ঠিক শিল্পী হতে পারে না। বড় বড় কয়েকজন গায়কের নাম উচ্চারিত হলেই পারমিতা এমন উচ্ছ্বাস দেখায়, যেন ঐ গায়কেরা তার প্রেমিক। পারমিতা একদিন বলেও ফেলেছিল, ওস্তাদ মইজুদ্দিন খাঁ চাইলে ও সব কিছু দিয়ে দিতে পারে। আমি অবশ্য এই নিয়ে পারমিতার সঙ্গে মজা করি।

সুজাতাকে আমি মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিয়েছি, এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। মনে পড়ে মাঝে মাঝে। হঠাৎ হঠাৎ!

সুজাতার খবরও কিছু কিছু কানে আসে।

কলেজ ছাড়ার পর সুজাতা বিলেতে চলে গেছে পড়াশুনো করতে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা? এই জন্যই কি সুজাতা আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটাকাটি করেছিল? সে ভেবেছিল, আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আমি কোনোদিন ঐ সব দেশে যেতে পারবো না?

ইকোনমিক্সে আমার রেজাল্ট নেহাৎ খারাপ হয়নি। বিলেত আমেরিকায় একটা কিছু স্কলারশীপ জোগাড় করা আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত হতো না। আমার বন্ধুদের মধ্যে চার-পাঁচজন চলে গেছে, তার মধ্যে দু-জনের রেজাল্ট আমার চেয়েও নীচে ছিল। কিন্তু সুজাতা গেছে শুনেই বিলেত-অ্যামেরিকার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

অফিস থেকে আমাকে এর মধ্যে দু-বার লণ্ডন ঘুরিয়ে এনেছে। সুজাতা শেফিল্ডে থাকে জেনেও আমি তার কোনো খোঁজও করিনি।

॥ ৬ ॥

সল্টলেকের জমিটা আজ রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। বাড়ির প্ল্যানও রেডি। সামনের মাসেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। পারমিতার ইচ্ছে অন্তত ছ'খানা ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি করা. আমি আপাতত একতলার বেশি চাই না। বেশি বড় বাড়ি করা ভালো দেখায় না। পেছনে ভিজিলেন্স লেগে যেতে পারে।

ঠিকঠাক ট্যাক্স দিয়ে বাঁধা মাইনের চাকরিতে কোনো ভদ্দরলোকের পক্ষে বাড়ি বানানো অসম্ভব। অনেক লোক রিটায়ার করার পর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটির সব টাকা দিয়ে একখানা বাড়ি বানায় এবং সেটা ভোগ করার আগেই দু'চার বছরের মধ্যে টুক করে মরে যায়। আমি ওসব বাজে ব্যাপারে নেই। যা কিছু ভোগ করার, তা যৌবন বয়েসেই চাই। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কিনেছি আগেই। মাসে এখন প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা উপরি রোজগার হয়। নেহাৎ এখনো চক্ষুলজ্জা আছে তাই, নইলে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা তো কিছুই না। আমার হাত দিতে প্রায় এক কোটি টাকার বিল পাশ হয়, এর মাত্র এক পার্সেন্ট তো যে-কোনো পার্টিই হেসে খেলে দিতে রাজি।

চাকরি পাবার পর প্রথম চার বছর একটা আস্তো গাঁড়লের মতন একটা পয়সাও নিইনি কারুর কাছ থেকে। তখনও একটা ফাঁপা আদর্শবাদ মাথা জুড়ে ছিল যে! মনে আছে, প্রথম যে লোকটি আমাকে ঘুষ দেবার সামান্য ইঙ্গিত করেছিল, তার ওপর এমন রেগে গিয়েছিলুম যে, টং টং করে বেল বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে লোকটিকে বলেছিলুম আমার চেম্বারে থেকে দূর করে দিতে। জেনারাল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলুম, যেন ঐ ফার্মকে ব্ল্যাক

লিস্টেড করা হয়। জেনারাল ম্যানেজার আমার প্রশংসা করেছিলেন, সহকর্মীরা আমার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল, তবু কোনো এক অলৌকিক উপায়ে সেই ফার্মটি ঠিকই অর্ডার পেয়ে গেল।

সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে গেলে সহকর্মীরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কেউ কেউ কাঁধ ঝাঁকায়। জেনারাল ম্যানেজার সেবারই আমাকে একটা ট্রেইনিং-এর জন্য বিলেত পাঠালেন।

আমারই সমান পোস্টের এক ডি পি ও, অর্থাৎ ডেপুটি পারচেজ অফিসার তার বাচ্চা মেয়ের জন্মদিনে সাড়ে চারশো লোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো। একটা ঘরে উপহারের পাহাড় জমে গিয়েছিল। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে পারমিতা জিজ্ঞেস করেছিল, ঐ উৎপল ব্যানার্জি আর তোমার টেবিল সমান মাপের?

আমাদের দুই ছেলে মেয়ের জন্মদিনে কাছাকাছি কোয়ার্টারের দু' চারটি বাচ্চা ছাড়া আর কারুকেই নেমন্তন্ন করা হয় না। সাড়ে চারশো লোক খাওয়ানো মানে চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকার ধাক্কা। অবশ্য উৎপল ব্যানার্জির মেয়ে সোনা-রূপোর গয়না উপহার পেয়েছে অনেক।

উৎপল ব্যানার্জির স্ত্রী ছবির গলা দিয়ে একবার রক্ত পড়তেই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায় এক নামকরা নার্সিংহোমে।

আমাদের দুর্গাপুরে ভালো হাসপাতাল আছে! কিন্তু উৎপল কোনো চান্সই নেয়নি। ছবির অবশ্য সাধারণ ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল, সেই নার্সিংহোমে পনেরো দিন থেকে, সব রকম চেক-আপ করিয়ে সে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। ওদের বাড়িতে কিছুদিন পরেই আবার একটা বড় পার্টি হলো।

পারমিতার সহজে কোনো অসুখ বিসুখ হয় না। ভালো স্বাস্থ্য। কিন্তু একবার কলকাতায় ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স শুনে ফিরে আসার ঠিক পরদিনই সে অবিকল উৎপলের স্ত্রী ছবির মতন রক্ত বমি করলো।

দুর্গাপুরে বড্ড কনকনে শীত পড়ে। গোটা শীতকালটা সাবধানে

না থাকলে অনেকেরই ব্রঙ্কাইটিস হয়ে যায়। ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমে যাওয়া তো দূরের কথা, হাসপাতালেও যাওয়ার দরকার হয় না, ডাক্তার বাড়িতে এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু উৎপলের স্ত্রী ছবি যদি যেতে পারে, তা হলে. আমার স্ত্রী পারমিতা কেন কলকাতায় চিকিৎসা করতে যাবে না? অযাচিতভাবে পারমিতাকে দেখতে এসে কয়েকজন জিজ্ঞেস করলে, কোন্ নার্সিং-হোমে ভর্তি হচ্ছো? একবার থরো চেক্‌আপ করিয়ে নেওয়া ভালো।

টাটা-বিড়লারা এখন নার্সিংহোমের ব্যবসাও করে। সেখানে কোনো সরকারি অফিসারের স্ত্রীর কি চিকিৎসা করানোর সাধ্য থাকতে পারে? তবু অনেকেই যায়।

সেবারই আমি এখানে স্ত্রীর নামে একটা এজেন্সি খুললাম। এটাই আইনসম্মত প্রথা। আমাদের পাঁচ লাখ টাকার স্পেয়ার পার্টস কিনতে হবে, যে-কোম্পানি সেগুলো সাপ্লাই করার জন্য মনোনীত হলো, আমার স্ত্রী তার একজন স্লিপিং পার্টনার। দুর্গাপুর ক্লাবে মিঃ বাজোরিয়া আমাকে সাড়ে সাত হাজার টাকার নোটসমেত একটা খাম দিল গোপনে। পারমিতার চিকিৎসার খরচ।

খামটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল একটু দূরে দরজার কাছে একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরা আধখোলা খোঁপা, সরল, গভীর দুটি চোখ। সুজাতা!

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুজাতা নীরবে বললো, ছিঃ অনীশ, তোমার কাছ থেকে এ রকম আশা করিনি!

বলাই বাহুল্য, সেই মহিলা সুজাতা নয়। অন্য একজন, অনেকটা সুজাতার মতনই শরীরের গড়ন, তবে সুজাতার মত এর সৌন্দর্যের জ্যোতি নেই।

আমিও মনে মনে বললুম, সুজাতা, তুমি কেন আমায় ছেড়ে চলে গেলে? যদি তুমি অকারণে আমায় আঘাত না দিতে, তা হলে আমিও এ রকম বদলে যেতুম না!

॥ ৭ ॥

পারমিতার বাপের বাড়ি টালিগঞ্জ। বাচ্চারা সমেত পারমিতাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি করে আমি ফিরছি, আমাকে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে, হঠাৎ কী খেয়াল হলো ট্যাক্সিটা ঘোরাতে বললুম এলগিন রোডে। কিছুদূরে গিয়ে তাকে দাম মিটিয়ে ছেড়ে দিলুম। সুজাতাদের বাড়িটা আরও জরাজীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনো বিক্রি হয়নি, আশে পাশে অনেক নতুন ঝকঝকে বাড়ি উঠেছে, তবু সেই বাড়িটা পুরানো আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনে সুজাতার দাদা এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। অবিকল সেই আগেকার মতন ভুরু তোলা ভঙ্গি।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আমি বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলুম। সুজাতা এখানে নেই, সে বিলেতেই রয়ে গেছে।

তা হলে এই বাড়িটা হঠাৎ দেখতে আসার কী মানে হয়? ঐ বাড়িটার সঙ্গে মিশে আছে আমার প্রথম যৌবনের তীব্র ব্যর্থতা!

এই বাড়ির তিনতলার সেই ঘরটায় এখন কি অন্য কেউ থাকে? এ ঘরে সুজাতাকে আমি প্রথম চুম্বন করতে গিয়েছিলাম, সুজাতা আমার ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, এখনো সময় হয় নি! সারাজীবনেও আর সে সময় আসবে না!

॥ ৮ ॥

ওস্তাদ মজিদ খাঁ একটা অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন দুর্গাপুরে। ওঁর এখন দারুণ নাম। এক সন্ধ্যেবেলা গান গাইবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা নেন—গায়কদের এত রোজগার! আমি ক্লাসিক্যাল গান-বাজনা তেমন বুঝি না। তবু স্বীকার করতেই হবে যে মানুষটির কণ্ঠস্বরে জাদু আছে।

ওস্তাদজীর বয়েস বছর পঞ্চাশেক হবে, সুন্দর স্বাস্থ্য, চোখ দুটি

ায়াময়। তিনটি দিন তিনি আমাদের বাড়িতে থেকে গেলেন, তা নিয়ে পারমিতার কী গর্ব। আমাদের সোস্যাল স্টেটাস অনেক উঁচুতে উঠে গেল। অন্যদের আরও অনেক বেশি টাকা থাকতে পারে, কিন্তু অত বড় একজন ভারত বিখ্যাত গায়ক তো আমাদের বাড়িতেই উঠেছেন।

সেই তিনটি দিন পারমিতা কী মাতামাতিই না করলো! বেচারি গান বাজনা এত ভালোবাসে, সে তার স্বপ্নের গায়ককে এত কাছাকাছি পেয়েছে! সব রকম যত্ন আত্তি, এক সঙ্গে গলা সাধা, ওস্তাদজীর রেওয়াজের টেপ করা, এই সব নিয়ে মেতে রইলো পারমিতা। ছেলে-মেয়েদের দিকে নজর দেবারও সময় নেই।

আমাকে অবশ্য তিনদিনই অফিস করতে হয়েছে, তা ছাড়া গুরু-শিষ্যার অন্তরঙ্গতার মধ্যে আমি মাথা গলাতে চাইনি। পারমিতার আনন্দ উদ্ভাসিত মুখখানা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। পারমিতাকে বোধহয় আমিও কখনও এতটা আনন্দ দিতে পারিনি। গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে গিয়ে পারমিতা কি তার সব কিছু দিয়েছিল? অসম্ভব নয় মোটেই। ওস্তাদজীর সেই মায়াময় চোখে মাঝে মাঝে নারী-লোলুপতার ঝিলিক আমি লক্ষ করেছি। ওস্তাদজীর তিনটি স্ত্রী এবং সারা ভারতে তাঁর অনেক প্রেমিকা, কাগজেই এসব খবর বেরিয়েছিল এক সময়। গুণী শিল্পীদের জীবন তো এ রকমই হয়!

ওস্তাদজী যদি কখনো পারমিতার কাছ থেকে সব কিছু দাবি করে থাকেন, তাতে পারমিতা আপত্তিও জানাতে পারবে না, সে এমনই ঘোরের মধ্যে ছিল। ওস্তাজীর বিদায় নেবার সময় পারমিতার চোখ ছলছল করছিল, ওস্তাদজী তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলেন।

এতে দোষেরই বা কী আছে। পারমিতার আর বাচ্চাকাচ্চা হবে না, সে যদি একবার তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে শোয়, তাতে তার শরীরটা তো আর ক্ষয়ে যাচ্ছে না! এটাকে ঠিক ভালোবাসাও বলে

না। এক ধরনের মোহ, এর জন্য পারমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কে চিড় খাওয়ার কোনো কারণ নেই!

আমি নিজের চোখে ওদের সেই ধরনের ঘনিষ্ঠতা দেখিনি, আমি সন্দেহপ্রবণ মানুষও নই। তবু ঠাট্টার ছলেও ঐ কথাটা পারমিতাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না।

সপ্তাহখানেক বাদে এক রাত্রে পারমিতা নিজে থেকেই আমাকে আদর করতে এলো, আমার বুকে মাথা রাখলো।

সেই রাতে আমি বেশ খানিকটা হুইস্কি পান করেছিলুম। ওস্তাদজীর জন্য আমার দুটি বোতল স্কচ খরচ হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে আর স্টক ছিল না, সুতরাং বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল ইণ্ডিয়ান। শরীর বেশ উত্তপ্ত। পারমিতাকে জড়িয়ে ধরতেই অন্ধকারের মধ্যে ফট করে ভেসে উঠলো সুজাতার মুখ।

পারমিতাকে চুম্বন করে তেমন স্বাদ পেলুম না। মনে হলো জীবনে একটা পরম চুম্বন পাওয়াই বাকি রয়ে গেছে।

সুজাতা লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছে বছর তিনেক আগে। চাকরি করছে বম্বেতে। বিয়ে করেনি। এসব খবর অনন্যর মুখে শুনতে পাই।

অফিসের কাজে আমাকেও বছরে অন্তত পাঁচ-ছ'বার বম্বে যেতে হয়। সুজাতার খোঁজ করার কথা মনেও আসেনি।

কিন্তু এটা আমার কী হলো? পরপর তিন-চারবারই পারমিতার শরীরটা আমার কাছে নিরামিষ মনে হচ্ছে! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিককার সেই উন্মাদনা খানিকটা মিইয়ে যায় ঠিকই। কিন্তু পারমিতার সঙ্গে শুয়ে বারবার সুজাতার কথা মনে আসে কেন? সুজাতার শরীর আমি কখনো পরিপূর্ণভাবে দেখিনি, কিন্তু আজকাল প্রায়ই আমি তাকে মনে মনে নগ্ন করি!

॥ ৯ ॥

একটা এক্সপেরিমেণ্ট করা দরকার।

এলাহাবাদে তিন দিনের একটা কনফারেন্স ছিল। টুক করে করে সেখানে থেকে এক দিন পালিয়ে চলে এলুম কাশীতে।

ছাত্রজীবনে কাশীতে এসে একেবার এক মধ্যবয়স্ক দাদার পাল্লায় পড়ে একটা বাঈজীর বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বেশ ভয় ভয় করেছিল সেবার, মনের মধ্যে খানিকটা পাপবোধও ছিল। একটি মেয়েকে ভালোবেসে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাটা অন্যায় মনে হতো। এখন ওসব বিবেকের দায় চুকে গেছে। পকেটে পয়সার জোর থাকলে এইসব পাড়ায় আসতে ভয়ও করে না।

ডালপট্টিতে একজন দালালকে ধরে এলুম সুর্মা বাঈজীর ঘরে। ছদ্ম নামটা এই মেয়েটিকে বেশ মানিয়েছে। হয়তো বছর পঁয়তিরিশেকের মতন বয়েস, দেখায় পঁচিশ বছরের মতন, চোখ দুটি বেশ দীঘল কালো। মাথায় অনেক চুল, ঠোঁটে লাস্য আছে।

প্রথমেই পাঁচ শো টাকা দিয়ে বললুম ড্রিংকস আনতে। বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমি কোনো কার্পণ্য করবো না, তার বদলে আমি যা-চাই, তাই-ই আমাকে দিতে হবে। সুজাতা নাচ জানতো না, তেমন কিছু গানের গলাও ছিল না। এই বাঈজীর সঙ্গে সুজাতার চেহারারও কোনো মিল নেই।

তবু সুজাতার মুখখানা যেন বাতাসে ভাসছে। তার চোখে তীব্র ভৎর্সনা। আমাকে এই ভূমিকায় সে একটুও পছন্দ করছে না। সে আমাকে পছন্দ-অপছন্দ করার কে? আমি সিগারেটের ধোঁয়ায় সেই মুখখানা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

আজকাল প্রায়ই এমন হয়। চুপচাপ একলা বসে থাকলেই সুজাতা আমার কাছে চলে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা রোমাঞ্চ হয়। আমার ঠোঁটের ওপর থেকে যেন হাত সরিয়ে নিয়েছে

সুজাতা, আমি তার ছায়ামূর্তিকে চুম্বন করছি, সে রকম চুম্বনের স্বাদ পৃথিবীর আর কোনো নারীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না!

সুর্মা বাঈ পরপর দুটো গান শেষ করলো। আমার মন লাগছে না। ঝোঁকের মাথায় নেশা করে ফেললুম অনেকটা। নেশা না করলে কি এক ঘণ্টার পরিচয়ে কোনো নারীকে স্পর্শ করা যায়?

তাতেও কিছু লাভ হলো না।

সুর্মা বাঈকে জড়িয়ে ধরে আমি সর্বক্ষণ আসলে সুজাতাকেই আদর করতে লাগলুম।

॥ ১০ ॥

সল্টলেকের বাড়ির আজ ছাদ ঢালাই হচ্ছে। আমি একটা রঙীন ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। হঠাৎ এক সময় আমার মনে হলো, আমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি? কী হবে এই বাড়ি তৈরি করে? আমার বুকটা অসম্ভব কষ্টে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি সুজাতাকে পাইনি, এই জীবনে যেন আর কোনো কিছু পাওয়ারই মূল্য নেই!

প্রথম তিন-চার বছর এমন হয়নি, সুজাতাকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলুম। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিদিনই সুজাতা আমার কাছে ফিরে আসে। সে আমাকে চরমভাবে হারিয়ে দিয়ে যেন আনন্দ পায়।

পাশেই আর একটা বেশ বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ইচ্ছে করলে আমিও ঐরকম বাড়ি তৈরি করতে পারতুম। সুজাতাদের এলগিন রোডের বাড়িটাও কিনে নেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য নয়। টাকা আমি কম রোজগার করিনি। এবং তার অনেকখানিই আইনমাফিক টাকা। পারমিতার নামে সত্যি সত্যি আলাদা একটা ব্যবসা চালিয়ে ভালো প্রফিট হচ্ছে। অফিসেও আমার সুনাম আছে। অনেকে বলে অনীশ রায় কাজ পাগল মানুষ। হ্যাঁ, অফিসের কাজে আমার

কোনো খুঁত নেই। সর্বক্ষণ আমি কাজে ডুবে থাকতে চাই! আমার ছেলে মেয়ে দুটি ভালো স্কুলে পড়ছে, ব্যবহারও চমৎকার। পারমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কে কোনো ফাটল ধরেনি। ওস্তাদ মজিদ খাঁ আর দুর্গাপুরে আসেননি, পারমিতার কাছে সেই তিনটি দিন শুধু এখন মধুর স্মৃতি। আর কোনো একটা কনফারেন্সে ওস্তাদজী পারমিতাকে দেখে স্টেজ থেকে হাত নেড়েছিলেন, ব্যস ঐ পর্যন্ত। অত্যন্ত ভিড়ের চাপে পরে পারমিতা আর তাঁর কাছে যেতে পারেনি, বিশেষ চেষ্টাও করেনি। দুর্গাপুরের দু-একটা ফাংশনে অন্যান্য অফিসারদের স্ত্রীর সঙ্গে পারমিতাও গান করে। সে বেশ আনন্দেই আছে।

পারমিতাকে আমি ভালোবাসি। পারমিতা আমাকে সুন্দর সাহচর্য দেয়। তার শরীরেও বেশ উত্তাপ আছে।

আমি সুজাতার খোঁজ করি না। এর মধ্যে একবারও তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি নি। সে বম্বেতে থাকে, তার ঠিকানা জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু একবার আমি তাকে বিদায় জানিয়েছি। কেন আবার তার পায়ে লুটোতে যাবো!

আমি সুজাতাকে বিদায় জানিয়েছি, তবু সে কেন ফিরে ফিরে আসে? বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে? মৃত্যুশোক থেকে একটা প্রেতিনীর মতন?

আমাদের সমস্যাহীন সংসার। টাকা পয়সার অভাব নেই। সব দিক থেকেই তো আমরা সুখী! তবু ঐ হারামজাদীটা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে! কোনো কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই!

শুধু সে সুর্মা বাঈ নয়, তার পরেও আরও দুটি মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

আজকাল প্রত্যেক পার্টিতেই একজন দু'জন তরুণী থাকে, তারা কী রকম যেন ছলছলে চোখে তাকায়। একটু প্রশ্রয় দিলেই তাদের সঙ্গে আলাদা দেখা করা যায়। আগে আমার এসব জানা ছিল না।

কিন্তু সেই দুই তরুণীও সুজাতার বিকল্প হতে পারেনি। প্রত্যেক-বার আমি হেরে গেছি। সুজাতা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাথরুমে স্নান করার সময় এক-একদিন আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। নিজেরই বাহুতে একটা চুম্বন দিয়ে ভাবি যেন সুজাতাকেই আদর করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর উষ্ণ হয়ে যায়। শুধু কল্পনাতেই আমি সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে যত রোমাঞ্চ বোধ করি, কোনো বাস্তব নারী আমাকে তা দিতে পারে না!

হারামজাদী! সে শুধু আমাকে তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেনি, আমার জীবনের সব রকম সার্থকতা, আমার বাকি জীবনের নারীসঙ্গ সুখও সে কেড়ে নিয়েছে!

সুজাতা আমার সঙ্গে পুরী যেতে চেয়েছিল; আমাকে সেদিন টাকার চিন্তায় চুপ করে থাকতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর জীবনে কত টাকা রোজগার করেছি। কী লাভ হলো? এক এক সময় সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়।

॥ ১১ ॥

কলকাতায় এলে অনন্যর সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে। অনন্য প্রায়ই বম্বে যায়, সুজাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। অনন্য এমন ভাব দেখায় যেন সুজাতার সঙ্গে তার প্রেম; আন্ধেরি ওয়েস্টে সুজাতার ফ্ল্যাট, সেখানে সে একলা থাকে, একবার হোটেলে জায়গা না পেয়ে অনন্য সুজাতার কাছে ছিল এক রাত।

সেই বৃষ্টির দিনে সুজাতা আমার হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার পর জল-জমা কলেজ স্ট্রিটে একটা সাদা রঙের গাড়ি সুজাতাকে তুলে নিয়েছিল। গাড়ির রংটাও আমি ভুলি নি।

সেটা ছিল অনন্যর বাবার গাড়ি, অনন্যও মাঝে মাঝে চালাতো। তবু অনন্যর সঙ্গে সুজাতা কথা বলতো উপহাসের ভঙ্গিতে। অনন্যর চেহারাটাও বেশ সুন্দরই বলা যায়। রং ফর্সা, সিনেমায় নামলে ন্যাকা প্রেমিকের রোলে মানিয়ে যেত।

অনন্যদের সেই গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। অনন্য বিলেত যায়

নি। আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুজাতা অনন্যর সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা করে নি, সেটুকু আমি জানি। এখন নতুন করে বন্ধুত্ব হয়েছে ওদের?

অনন্যর কথা ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। জীবনে সেরকম কিছু করতে পারেনি অনন্য। আমাকে হিংসে করে, তা বুঝতে পারি। সুজাতার কথা তুলে আমাকে খোঁচা মারতে চায়।

কলকাতায় একটা বেশ বড় টেণ্ডারের স্পেশিমেন ইনস্‌পেকশানের জন্য দু-তিন দিন থাকতে হলো। শ্বশুরবাড়িতে না উঠে গভর্নমেণ্টের টাকায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রইলাম। সেখানে অর্জুন চৌধুরী নামে একজন লোক কার্ড পাঠিয়ে দু-তিনবার দেখা করতে চেয়েছে, আমি পাত্তা দিইনি। পার্টির কোনো লোকের সঙ্গে এই সময় দেখা করা নিয়ম নয়।

দুর্গাপুরে ফেরার পর সেই অর্জুন চৌধুরী একদিন অফিসে এসে হাজির হলো। বেশ দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। নাম দেখে বুঝতে পারিনি, দেখেই চিনেছি। সুজাতার ছোড়দা, এঁকে আমরা বলতুম মন্তাদা, বেশ ভালো ক্রিকেট খেলতেন। সেই ভুরু তুলে কথা বলার ভঙ্গি। একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে আমি বললুম, বসুন মিঃ চৌধুরী, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

মুখে একটা জ্বলন্ত পাইপ। আর কোনো কোম্পানির লোক আমার ঘরে পাইপ মুখে দিয়ে কথা বলার সাহস পায় না। অন্যদের মুখে একটা তেলতেলে হাসি লেগে থাকে, মন্তাদা এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন তিনি আমাকেই দয়া করতে এসেছেন।

আমার কাছে উনি কিছু সুযোগ সুবিধে চাইতে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রথমেই সে কথা তুললেন না। পুরনো বনেদীয়ানা, ভাঙবে তবু মচকাবে না। মিনিট দশেক ধরে আমার সঙ্গে কাজের কথা বলে গেলেন।

আমার পুরোপুরি সরকারি ব্যবহার দেখে মন্তাদা এক সময় বললেন, এক্সকিউজ মী, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, আপনি অনীশ রায়, মানে, তুমি কি সুজাতার বন্ধু সেই অনীশ?

হ্যাঁ কিংবা না কিছুই না বলে আমি শুধু একটু হাসলুম।

মন্তাদা বললেন, তোমাকে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি। একবার আমাকে ক্যারাম খেলে হারিয়ে দিয়েছিলে! মনে আছে। আমি সুজাতার ছোড়দা।

অর্থাৎ মন্তাদার ভাবখানা এমন, আমি সুজাতার ছোড়দা, এবার তুমি বুঝে নাও আমাকে কতখানি সাহায্য করবে! সব দায়িত্ব তোমার।

আমি তবুও কোন মন্তব্য করলুম না।

মন্তাদা আবার বললেন, সুজাতা এখন বম্বেতে আছে জানো তো? শিগগিরই একবার কলকাতায় আসবে। ও তো আবার বিয়ে করলো।

আমার ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে গেল। আবার মানে? অনন্য বলেছিল সুজাতা বিয়েই করেনি। অনন্যটা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী!

মন্তাদা চলে যাবার পরই আমি উৎপল ব্যানার্জিকে ডেকে পাঠালুম। মাঝখানে উৎপলের নামে একটি পার্টি মামলা করেছিল বলে ওর প্রমোশোন আটকে গেছে। এখন উৎপল আমার সাবর্ডিনেট, সুতরাং আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। অথচ হাসি মুখে কথা বলে।

যে-ফাইলটায় মন্তাদার স্বার্থ আছে, সেটা উৎপল ব্যানার্জির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, এই কেসটা পুরোপুরি আপনিই ডিল করবেন। আপনার সিদ্ধান্তই ফাইনাল। আমার মতামত নেবারও কোনো দরকার নেই।

ফাইলটা নিয়ে উৎপল ব্যানার্জি দরজার কাছে যেতেই আমি আবার মত বদলে ফেলে বললুম, আচ্ছা দাঁড়ান, ফাইলটা বরং ছ মাস পেণ্ডিং রাখুন। ঐ আইটেমটা তেমন জরুরি নয়। পার্টিরা খোঁজ নিতে এলে বলবেন, আমরা একসঙ্গে আরও বেশি মালের অর্ডার দেবো, অন্তত লাখ পঞ্চাশেক হবেই, তবে এখন না, ছ মাস বাদে। টেণ্ডারের ওপিনিং-এর তারিখ পিছিয়ে দিন।

মন্তাদাকে হতাশ কিংবা খুশি কোনোটাই করতে চাই না। তার চেয়ে ঝুলিয়ে রাখা অনেক ভালো। দেখা যাক, তাতে তার ভুরু নীচু হয় কি না!

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। এক মাস বাদেই মন্তাদা আমার বাড়িতে একটা মস্ত বড় কেক আর ছ বোতল স্কচ পাঠিয়ে দিল। আমি কোন ব্র্যাণ্ডটা পছন্দ করি, তা পর্যন্ত গোপনে খবর নিয়েছে! এই তো নামতে আরম্ভ করেছে একটু একটু করে। সুজাতার সঙ্গে যত দিন আমার ভাব ছিল, সেই সময় আমি এক ফোঁটাও মদ্যপান করতুম না। পারমিতা ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে গেছে। এখানে জন্মদিন লেগেই থাকে। বাড়ি ফাঁকা। অনেকক্ষণ ধরে সুজাতা আমার ঘরে এসে বসে আছে। আমি তার শরীরের পরাফিউমের গন্ধও পাচ্ছি।

সুজাতার মুখে, বুকে চুমু খেতে কোনো বাধা নেই। সমস্ত শরীরে আমার শিহরন হচ্ছে। ঠিক যেন আমার সেই বাইশ বছর বয়েসে ফিরে গেছি!

॥ ১২ ॥

সুজাতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যিই দেখা হলো। ঠিক বারো বছর পর।

কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করলে চেনাশুনো কারুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য কিছু না।

অফিসের কাজেই তিনটে মিটিং সেরে বিকেলের দিকে বেশ ক্লান্ত হয়ে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে গিয়ে বসলুম পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয়। খানিকক্ষণ সময় কাটাবার জন্য। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেল। রীতিমতন আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। রাস্তায় এখনও জল জমেনি অবশ্য, কিন্তু এত বৃষ্টিতে বেরুনো যায় না। দ্বিতীয় বার বীয়ার নিতে হলো।

সেই সময় ঢুকলো সুজাতা। সঙ্গে আরও দু'জন পুরুষ। কিছু একটা কথা বলতে বলতে ওরা ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি ঠিক দরজার সামনের টেবিলেই বসেছি বলে সুজাতার সঙ্গী একজন পুরুষের সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়ে গেল। নাম মনে নেই, তবে লোকটিকে আমি দু-বার দেখেছি কোথাও। সামান্য মুখ চেনা। কিছু একটা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

সেই লোকটা হঠাৎ প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বললো, এই যে অনীশবাবু, আপনি কলকাতায়? কবে দুর্গাপুর ফিরছেন? আমি আগামী সপ্তাহে একবার যাবো ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি বললুম, হ্যাঁ, আসবেন। তার মধ্যে ফিরে যাবো।

সুজাতাকেও দাঁড়াতে হয়েছে। সে আমাকে এড়াবার কোনো চেষ্টা না করে মুখে অনেকখানি হাসি ফুটিয়ে বললো, অনীশ! কত দিন পরে দেখা। কেমন আছো?

আমিও হেসে বললুম, ভালো! তোমার খবর কী, সুজাতা?

সুজাতা বললো, আমার খবর ভালোই। ছোড়দার মুখে শুনছিলুম, তুমি দুর্গাপুরেই থাকো।

এরপর আরও দু-চারটি সামান্য টুকিটাকি কথাবার্তা। তারপর সুজাতা ও তার সঙ্গীরা চলে গেল একটা ভেতরের টেবিলে।

মানুষ কত মিথ্যে কথাই বলে! সুজাতার জন্য আমি সর্বক্ষণ জ্বলছি, আজ সকালেও অনেকক্ষণ চিন্তা করেছি তার কথা, অথচ তাকে স্বচক্ষে দেখবার পর মামুলিভাবে বললুম, ভালো! এক বৃষ্টির দিনে সুজাতা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর এক বৃষ্টির দিনে তার সঙ্গে আবার দেখা। আমি আর অপেক্ষা না করে সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

সুজাতা অন্য এক টেবিলে অন্য লোকদের সঙ্গে বসে আছে, এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি সামান্য ইচ্ছে প্রকাশ করলেই সেই টেবিলের লোকেরা আমাকে খাতির করে ডেকে নিয়ে যেত। কিন্তু

সুজাতার সঙ্গে কথা বলার কোনো আগ্রহও তো আমার নেই। আমি যখন একা থাকি, তখনই সুজাতাকে খুব নিবিড় করে পাই। অন্য সময় আমি পারমিতার স্বামী। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ, অনেকের চোখে আমার বেশ গুরুত্ব আছে!

সুজাতা কলকাতায় এলো কেন? এক শহরে আমার আর সুজাতার একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। আজই দুর্গাপুরে ফিরে যেতে হবে।

সুজাতা আমার কেউ না!

॥ ১৩ ॥

অনন্যর সঙ্গে দেখা হতেই সে প্রায় বিনা ভূমিকায় দশ হাজার টাকা ধার চাইলো।

আমি চোখের একটাও পাতা না কাঁপিয়ে ব্রিফ কেস খুলে ক্যাশ পাঁচ হাজার টাকার নোট তুলে দিলুম ওর হাতে। কেন সে চাইছে, সে সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই। দশ হাজারই দিতে পারতুম, সঙ্গেই ছিল, কিন্তু ঐটুকু অপমান না করলে চলে না। জানি অনন্য ও টাকা কোনোদিন ফেরত দেবে না, আমিও আশা করি না। তা ছাড়া, যারা ধার চায়, তারা একটু বাড়িয়েই চায়। আমাদের কলেজ জীবনে অনন্য ওর বাবার গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াতো। টাকা ওড়াতো দু'হাতে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বলে আমার প্রতি ওর একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। অনন্যকে টাকা ধার দিয়ে আমার মেজাজটা বেশ প্রসন্নই হলো। অনন্যর কাঁধ চাপড়ে বললুম, চল, গ্র্যাণ্ড হোটেলে আজ ডিনার খাই। অনেক দিন আড্ডা মারা হয়নি।

যারা একসময় আমাকে গরিব বলে জানতো, তাদের সামনে বড়লোকি দেখাতে না পারলে আর টাকা রোজগার করে লাভ কী?

অনন্য যে সুজাতার ব্যাপারে আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল. সে

জন্য আমি কিছু মনে করিনি। ও তো কোনো না কোনো দিক থেকে জিতবার চেষ্টা করবেই।

খানিকটা মদ পেটে পড়তেই অনন্যর মুখ থেকে আসল গল্পটা বেরিয়ে এলো। লণ্ডনে সুজাতা একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিল। এক বছরের মধ্যে সেপারেশান হয়ে যায়। তারপর বম্বেতে সুজাতাকে বিয়ে করবার জন্য তিনজন লোক খুব ক্ষেপে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একজন খুবই বিদগ্ধ মারাঠী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুজাতা একজন বাঙালীকেই বিয়ে করেছে দু বছর আগে, কিন্তু সেই বিয়েটাও খুব সার্থক হয়নি। অনন্যর ধারণা, ও যদি আগেই একটা বাজে বিয়ে না করে ফেলতো, তা হলে নির্ঘাত সুজাতা ওরই ঘরণী হতো।

বিবাহিত জীবনে সুখ পায়নি সুজাতা, তা জেনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সুজাতার মতন মেয়ের একটা সুন্দর জীবন প্রাপ্য ছিল। আমার সঙ্গে যদি দৈবাৎ বিয়ে হতো সুজাতার, তা হলেও কি সে সুখী হতো? সুজাতা আমার স্ত্রী হলে ঘুষ নিতাম না, বড়লোক হতুম না, আমি একজন আদর্শবাদী, মধ্যবিত্ত. কিছুটা তিক্ত মানুষ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতুম। সে জীবন কি সুজাতারও কাম্য হতো?

সুজাতার দ্বিতীয় স্বামী ওর ছোড়দা মন্তাদার সঙ্গে পার্টনারশীপে ব্যবসা করে বড়লোক হবার চেষ্টা করছে। আঃ ওদের আমারই কাছে আসতে হবে কেন? এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ওদের কোনো ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না, আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না। আবার আমি ইচ্ছে করলেই একটা বড় অর্ডার পাইয়ে ওদের ব্যবসাটা দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

সুজাতা যেন তার স্বামী কিংবা ছোড়দার হয়ে আমার কাছে কোনোদিন অনুরোধ করতে না আসে! সুজাতার ততখানি অধঃপতন কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারবো না!

॥ ১৪ ॥

এক বছর আগেও মনে হয়েছিল, রক্ত মাংসের সুজাতার সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় সুজাতার সঙ্গে দেখা হবার দিন দশেক বাদে আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল।

বিনা কারণে দুর্গাপুরে অফিস করতে করতে হঠাৎ বেরিয়ে এসে, পারমিতাকে লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে, আমি চলে এলাম স্টেশনে। কলকাতায় পৌঁছেই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা এলগিন রোডে সুজাতাদের বাড়ি।

মন্তাদা যে আমাকে আকস্মিকভাবে দেখেও দারুণ খুশির ভাব দেখাবেন, তা আমি জানতুম।

রীতিমত হৈ চৈ করতে লাগলেন। সুজাতাকে ডাকলেন, বড়দাকে ডাকলেন। আমি এ বাড়িতে গণ্যমান্য অতিথি। এক সময় আমি এ বাড়িতে যখন আসতুম, একমাত্র সুজাতা ছাড়া অন্য কেউ বিশেষ পাত্তাই দিত না। আমার চেয়ে অনন্য, গৌতমদের বেশি খাতির ছিল, কারণ ওদের বাবারা ছিলেন কলকাতায় কেষ্ট বিষ্টু ধরনের। এখন আমার বেয়াদপি করারও অধিকার আছে। আমাকে একতলার ঘরে বসিয়ে চা-টা খাওয়ানো হচ্ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললুম, চল, তোমার ঘরে যাই! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে!

অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে আজে বাজে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমার পকেটে কলম। একখানা সইতেই মন্তাদা আর সুজাতার স্বামীর ব্যবসা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আমি এ বাড়িতে নিজে থেকে এসেছি, তাতেই ওরা ধরে নিয়েছে যে অনেকখানি কাজ হয়ে গেছে!

সুজাতার বরটি কোথায়? তাকে তো দেখছি না। তাকে দেখবার আগ্রহও আমার নেই।

সুজাতা কিছু বলার আগেই আমি ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালুম।

মস্তাদা, আর বড়দারা সামান্য আপত্তিও জানালো না। হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইলো। ওদের সামনে দিয়ে আমি কাঠের সিঁড়িতে ধপ ধপ শব্দ করতে করতে উঠে গেলুম ওপরে।

ঘরখানা ঠিক আগের মতনই আছে। জানলার ধারে খাট পাতা। দরজার পাশটায় টেবিল ও চেয়ার। দু দিকের দেয়াল জোড়া র‍্যাকে প্রচুর বই। খুঁজলে ওর মধ্যে আমারও কিছু বই পাওয়া যাবে হয়তো, সুজাতার কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত বইগুলো ফেরত নেওয়া হয়নি।

দরজাটা বন্ধ করে দিলেই বা ক্ষতি কী?

একটা পাল্লা শুধু ভেজানো রইলো। আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। ঠিক কোনো কথা তো ভেবেও আসিনি। শুধু সুজাতাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করেছিল।

সুজাতার চেহারা অনেকটাই আগের মতন আছে। দুটি বিবাহের ছাপ পড়েনি। মেদহীন, উন্নত শরীর। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। জীবনের কাছ থেকে এই নারীর অনেক কিছু প্রাপ্য ছিল।

একটু পরে সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি অনেক বদলে গেছ, অনীশ?

আমি জোর দিয়ে বললুম নিশ্চয়ই! আগে আমি একটা বোকা. ইডিয়েট ছিলুম!

মুচকি হেসে সুজাতা বললো, এখন বুঝি অনেক বুদ্ধিমান হয়েছো? অবশ্য তোমার মুখ দেখলে মনে হয়, বেশ প্র্যাকটিক্যাল হয়েছো ঠিকই।

সুজাতা, তোমার মনে আছে, ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে, এক যুগ আগে তুমি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলে, এখন নয়। এখনও সময় হয়নি!

অনীশ, সেই সামান্য কথা তোমার এত দিনেও মনে আছে?

মনে থাকবে না? সেটা সামান্য কথা! সেই থেকে তুমি আমাকে বন্দী করে রেখেছো!

তার মানে?

আমি সুজাতার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। সুজাতা আমার এত কাছে? এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না! আমি টের পাচ্ছি, আমার বুক ধক ধক করছে, মুখের চামড়া টান-টান, নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

লোকে যাকে সার্থকতা বলে, তার সবই তো এসেছে আমার জীবনে। তবু সব সময় মনে হয়, জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল। বারোটা বছর এই মেয়েটা আমাকে একটা গভীর অতৃপ্তির মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আবার কি আমরা সেই বারো বছর আগে ফিরে যেতে পারি?

সুজাতা বললো, বসো, অনীশ। কত কথা জমে আছে। তোমার সব খবর বলো। তোমার বাড়ির কথা বলো।

আমি অস্থির ভাবে বললুম, আমার আর কিছুই বলার নেই। এই ঘরে এসে শুধু একটাই কথা মনে পড়ছে, তুমি আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলে, এখনও সময় হয় নি! তুমি সময়ের কাছে আমাকে সত্যিই বন্দী করে রেখেছো!

সুজাতা বললো, যাঃ, তা কখনো হয়! মানুষের জীবনে ও রকম কত ছোটখাটো ঘটনাই তো ঘটে!

পৃথিবীর কোনো মেয়েকে আমি আর চুমু খেতে পারিনি।

যাঃ, এটা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? তুমিই তো বললে, তুমি আর বোকা নেই। তুমি সেন্টিমেন্টালও নও, প্র্যাকটিকাল। বন্দী-টন্দি আবার কী?

মিথ্যে বলিনি, সুজাতা। অন্য দু-একটি মেয়েকে চুমু খেয়েছি ঠিকই, কিন্তু তুমি যেটাতে বাধা দিয়েছিলে, বলেছিলে সময় হয়নি, সেটা পাইনি বলে আর কোনো চুম্বনেই স্বাদ নেই। এরকম সত্যিই আমার মনে হয়।

ওটা ছিল একটা কথার কথা। অল্প বয়েসের লজ্জা। তার কি কোনো গুরুত্ব আছে? তুমি আমাকে কত অপমান করেছিলে অনীশ, আমি তো সেটা মনে রাখিনি!

আমি তোমার অপমান করেছি? কক্ষনো না! তুমিই বরং, অদ্ভুতভাবে এক দিন চলে গেলে। সেই বৃষ্টির দিন, আমি তোমার হাত ধরতে গেলে তুমি ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলে, তুমি আমার সঙ্গে এস না! মনে নেই।

মনে থাকবে না? কিন্তু কেন ওরকম ব্যবহার করেছিলাম?

সেটা তুমিই জানো! আজও আমি সেই উত্তরটা খুঁজছি!

থাক, ওসব কথা আর তুলে লাভ কী? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো, অনীশ!

না, বলো, কেন সেদিন অমন ব্যবহার করেছিলে?

এখন বললে ঠিক বোঝা যাবে না। এখন মনে হবে, সবটাই ছেলেমানুষী! কিন্তু তখন সাঙ্ঘাতিক রাগ হয়েছিল। তুমি আমাকে পুরী নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, এক হোটেলে।

তুমিই যেতে চেয়েছিলে। আমি উটি যাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলুম বন্ধুদের সঙ্গে, তুমিই বললে পুরীতে।

হ্যাঁ, বলেছিলুম। তখন আমার কীই বা বয়েস। যদি ঝোঁকের মাথায় বলেই থাকি, তুমি অমনি রাজি হবে? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবতে!

এর মধ্যে খারাপের কী আছে? তুমি নিজে আমার সঙ্গে পুরী বেড়াতে যেতে চাইলে।

এখন হয়তো কিছুই খারাপ মনে হবে না। সময় বদলে গেছে। এখন অনেক ছেলে-মেয়েরা যায়। কিন্তু বারো বছর আগে, আমাদের মতন রক্ষণশীল বাড়ি, তবু তুমি ভেবেছিলে, বিয়ের আগেই আমার মতন মেয়েকে কোনো হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফূর্তি করা যায়। আমার এমন অপমান লেগেছিল।

সেই তুচ্ছ একটা পুরী যাওয়ার কথা নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে

যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে? আমি তোমাকে খারাপ মেয়ে ভাববো কেন? আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমার চেয়েও সাহসী……

আমি অন্যদের সঙ্গেও খোলামেলা ভাবে মিশতুম, কিন্তু তুমি ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে আপন, অনীশ। কিন্তু তুমি যদি আমাকে সহজলভ্যা মনে করো, সেটা আমার কাছে অপমান নয়?

সুজাতা, আমি তোমাকে পুরী নিয়ে যাবার কথা একবারও মুখ ফুটে বলিনি। আমার টাকা পয়সা ছিল না। তোমার শখ হয়েছিল বলেই আমি…

তুমি কেন আমাকে বারণ করোনি, অনীশ? তুমি তো তারপর একবারও আমার কাছে আসোনি? এত তোমার অহংকার?

তুমি বিলেতে চলে গেলে, আমাকে একবার জানালেও না!

তুমি বারণ করলে আমি কিছুতেই বিলেত যেতুম না। থাক, থাক, উত্তেজিত হয়ো না, অনীশ। বসো আমরা গল্প করি। অন্য কথা বলি। আমাদের জীবন দু'দিকে ঘুরে গেছে, অনেক আলাদা হয়ে গেছে।

সুজাতা, আমার জীবনটা যেদিকে গেছে, সেদিকটা আমি মোটেই চাইনি। তুমিই সেদিকে ঠেলে দিয়েছো আমাকে। ঠিক যেন তুমি আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছিলে। তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারো না?

অনীশ, এখন কী আর তা হয়! আর কিছুই মিলবে না। আমরা এখন অন্যরকম।

আমি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুজাতার একটা হাত চেপে ধরে বললুম, আমি অন্য কিছু জানি না; আমি তোমাকে চাই।

সুজাতা ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললো, আমি একটা সামান্য মেয়ে!

আমি প্রায় বাঘের মতন গর্জন করে বললুম, আমার জীবনটা তুমি পুরোপুরি নষ্ট করে দেবে? আমি তোমাকে চাই!

কোনোদিন জোর করিনি সুজাতার ওপর, আজও সেটা সম্ভব নয়। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম ওর চোখের দিকে।

সুজাতা আস্তে আস্তে বললো, আমার কী ভুল হয়েছিল, আমি জানি না। কিন্তু সব কিছু হারিয়ে গেল। আমার জীবনটা আর আমার নয়!

আমার নিঃশ্বাসে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে, আমার শরীরটা কাঁপছে, আমি যেন এক অল্প বয়েসী প্রেমিক, আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কাতর গলায় বললুম, তোমাকে একবার অন্তত নিজের করে পুরোপুরি না পেলে কিছুই পাওয়া হবে না আমার জীবনে। আর সব কিছু আমার কাছে বিস্বাদ লাগে।

সুজাতা বললো, শুধু শরীরটা পাওয়া মানেই কি পাওয়া?

আমি জোর দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, শরীর! শরীর! তোমার ঐ শরীরের মধ্যেই আমার মুক্তি!

সুজাতা এগিয়ে এসে আগেকার মতন আমার গালে হাত দিয়ে আদর করলো।

তারপর জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। বুক থেকে আঁচলটা খসে পড়লো ওর। সুজাতা আবার বললো, আমি একটা সামান্য মেয়ে।

এত সহজ? বারো বছরের যন্ত্রণাটা কি তা হলে কিছুই না? এক্ষুনি সুজাতাকে আমি পেতে পারি? সুজাতার ভেজা ভেজা ঠোঁটে ঝিলিক দিচ্ছে, স্পষ্ট আহ্বান। লাল রঙের ব্লাউজের ফাঁকে উঁপছে উঠেছে স্বর্ণ রঙের বুক। এখন আর কল্পনায় নয়, ঐ ঠোঁটে, ঐ বুকে আমি মুখ রাখতে পারি সত্যি সত্যি। একেবারে বাস্তব!

কিন্তু এত সহজ! মাঝখানের বারোটা বছর তা হলে কোথায় গেল? এ কি আমার সেই সুজাতা, না অন্য কেউ?

সুজাতার বুকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আমি চোখ বুজলাম। ইস, কী সাঙ্ঘাতিক ভুলই না আমি করতে যাচ্ছিলুম?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি খুলে দিলুম দরজার ছিটকিনি।

সুজাতা বললো, এখন এখানে কেউ আসবে না।

আমি অট্টহাসি করে বললুম, পাগল নাকি! সন্ধে সাতটার সময়

দরজা বন্ধ করে এইসব, যাঃ তা কি হয়! আমি ইয়াকি করছিলুম তোমার সঙ্গে। চলো, নীচে যাই, সবার সঙ্গে গল্প করি।

সুজাতাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে আমি তরতর করে নেমে আসতে লাগলুম সিঁড়ি দিয়ে।

আসলে আমি পালাচ্ছি আমার ভুল থেকে। এত দিন তবু আমার কল্পনায় একজন নারী ছিল, যার চুম্বন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যার কথা চিন্তা করলেই আমার রোমাঞ্চ হয়। সুজাতার শরীরটা সত্যিকারের পেয়ে যদি আমার সে রকম না লাগে? যদি মনে হয়, সেও অন্য মেয়েদেরই মতন। তা হলে আমি আমার সেই কল্পনার নারীকেও চিরকালের মতন হারিয়ে ফেলবো যে! সুজাতা এখনো তিনতলার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু বুঝতে পারছে না। না বোঝাই ভালো। আজ পর্যন্ত বোধহয় আর কোনো পুরুষ এত কাছাকাছি এসেও ওকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সুজাতার বিস্ময়টা আমি উপভোগ করছি। ও নিজের হাতে দরজার ছিটকিনি দিয়েছিল, আমি সেটা খুলে দিয়েছি।

এরপর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যখন সুজাতা ঘনিষ্ঠ হবে, তখন কি মনে পড়বে আমার কথা? একটা অতৃপ্তি ওকে কুরে কুরে খাবে? যদি তা-ই হয়, তবে সেটাই আমার জয়।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, খুব জোরে, সুজাতার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে, যেন আর দেখা না হয়, আর সিঁড়িগুলো ফুরোচ্ছে না কেন?

লোভী

ভিক্ষে কর কেন? জোয়ানমদ্দ, গায়ে খেটে খেতে পার না?

এই কথা বলে বাবা বিপদে পড়ে গেলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, বাবু, একটা কাজ দিতে পারেন? কাজ গ্যান, ভিক্ষা করব না।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কাজ পার? রান্না জান?

লোকটি বলল, আইজ্ঞা না। রান্না করি নাই কখনো।

বাবা আবার বললেন, তাহলে তুমি কী কাজ জান? লোকে যে তোমাকে চাকরি দেবে, কী দেখে দেবে?

লোকটি বলল, চাষের কাজ জানি। জমিতে হাল দিতে পারি। নিড়ুনির কাজ পারি। গাই-বলদ চরাতেও পারি। দেবেন বাবু কাজ? একবার দিয়ে গ্যাখেন।

কলকাতা শহরে এসে লোকটা চাষের কাজ চাইছে। চাষের জমি দূরে থাক, সারা পৃথিবীতে আমাদের এক টুকরো ভূমিও নেই। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি। কলকাতায় কারই বা গোয়াল ঘর আছে?

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, চাষের কাজ জান তো গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় ভিক্ষে করতে এসেছ কেন? তোমার জমি নেই?

লোকটি দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমার ছিল না। আমার বাপেরও ছিল না।

আমরা না হয় রিফিউজিদের বংশ, তাই আমাদের মাটি নেই। কিন্তু পশ্চিম বাংলাতেও লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন চাষী। এবং কেন তারা গ্রাম ছেড়ে এক এক সময় শহরে ভিক্ষে করতে আসে, তা জিজ্ঞেস করাই বাহুল্যমাত্র। এ শহর এমন কত পরগাছাকে আশ্রয় দেয়।

লোকটি আমাদের দরজার সামনে বসে পড়ে বলল, বাবু, আপনি

বললেন, তাই আমি আর ভিক্ষা করব না। ভিক্ষা করা খারাপ। আপনি আমাকে যে-কোনো একটা কাজ দেন।

মুখের কথা ফিরিয়ে নেওয়া বাবার স্বভাব নয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন লোকটির দিকে। তারপর বললেন, উঠে এস। এখন কিছুদিন এখানেই থাক। তারপর তোমাকে মাটি কাটার কাজ দেব। অনেক দূরে যেতে হবে। ঠিক মতন খাটতে পারলে ভালই রোজগার করবে। তোমার নাম কী?

হারাধন।

ভেতবের দিকে তাকিয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, এই মিনু তোর মাকে ডাক তো! এই হারাধন • এখন থেকে বাড়ির কাজ করবে। আগে ওকে দুটি খেতে দে।

বাবা জেদী পুরুষ। আমাদেব পরিবারেব হিটলার। বাবার মুখের কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারুর নেই। মা অনেক সময় ঝগড়া ও কান্নাকাটি করেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার জেদটাই বজায় থাকে। আমাদের ভাই-বোনদের মতামতের তো কোনো মূল্যই নেই। বাঙাল পরিবারের এটাই রীতি। আমি তখন বি. এস. সি. পাশ করে প্রায় বেকাব, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রায়ই ভিক্ষে করি, বাবা তা জানতে পারেন না।

বাবার কাণ্ডজ্ঞান সত্যিই কম। আমাদের মাত্র ছোট ছোট তিন-খানা ঘর, আমরা চার ভাই-বোন, ছোট কাকাও আমাদের সঙ্গে থাকে, এর মধ্যে একটা বয়স্ক বাইরের লোককে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে? একটা বারান্দা পর্যন্ত নেই।

হারাধনের বেশ চওড়া শরীর, লম্বাও কম নয়, মুখে রুখু দাড়ি, বয়েস হবে বছর পঁয়তাল্লিশেক! কানা-খোঁড়া কিছু নয়, এরকম পুরুষকে ভিক্ষে করতে দেখলে রাগ হবারই কথা। তা বলে কি ওকে আমাদের বাড়িতেই রাখতে হবে? এদের আশ্রয় দেবার জন্য আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না কলকাতা শহরে?

বাবার বন্ধু গৌতমকাকা একজন মাটি-কাটা কনট্রাক্টার। যে সব

জায়গায় রাস্তা বা ব্রীজ বানানো হয়, সেখানে তিনি আড়াইশো-তিনশো মজুর খাটান। গৌতমকাকাকে বলে সেই কাজেই হারাধনকে ভিড়িয়ে দেবেন, বাবা এরকম ভেবে রেখেছিলেন। গৌতমকাকা আপাতত মালদায় একটা খাল কাটাচ্ছেন। মাস তিনেক আমাদের বাড়িতে আসেননি।

মুড়ির সঙ্গে বাদাম আর পেঁয়াজকুচি মিশিয়ে মাখা আর চা, এই আমাদের সকালের জল খাবার। হারাধনকেও সেই মুড়ি মাখা দেওয়া হল এক বাটি। বাথরুমে যাবার সরু প্যাসেজটায় উবু হয়ে বসে সে মুড়ি থেকে খোসা ছাড়ানো বাদাম কয়েকটা বেছে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলা কী?

আমি বললুম, তুমি বাদাম চেন না?

সে বিহ্বল ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আপন মনে বলল, বাদাম! বাদাম!

তারপর কয়েকটা মুখে দিয়ে এমন আস্তে চিবুতে লাগল, যেন বাদাম এক বিস্ময়কর বস্তু। লোকটা আগে কখনো বাদাম খায়নি নাকি?

আমার ছোড়দি ওকে জিজ্ঞেস করল, তোমার আর কে আছে? বউ, ছেলে-মেয়ে নেই? তারা কোথায়?

হারাধন বলল, আমার আর কেউ নাই।

হঠাৎ ঝপাঝপ বাদাম-মুড়ি সব শেষ করে ফেলে সে লোভীর মতন বলল, আর একটু দেবেন? বড় ভাল! বড় ভাল!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা বললেন, প্রথম দিনই এত! এখানে ওসব আব্দার চলবে না! যা দেওয়া হবে, তাই খাবে!

হারাধন মায়ের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, মা জননী, এই চরণে এস্থান দিয়েছেন, কোনোদিন নেমকহারামী করব না, আপনি বললে আমি নিজের গলাটাও কেটে ফেলতে পারি!

মা আঁতকে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, কী হে, তুমি কি গ্রামে যাত্রা-টাত্রা করতে নাকি?

সে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলল, আইজ্ঞে! তিনখানা পালায় অ্যাক্‌টো করিচি!

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, হারাধনের মাথায় বেশ গোলমাল আছে।

সে বেশি কথা বলে। রান্নাঘরের দরজায় বসে সে মায়ের সঙ্গে অনবরত বকবক করতে লাগল। তার গ্রামের গল্প। বনগাঁ সীমান্তের কাছে সরদার পাড়ায় তার বাড়ি। দু'পুরুষ আগেও তারা বিহারের লোক ছিল। তার বউ এবং তিনটি ছেলে-মেয়েও ছিল এক সময়। বউ আর এক মেয়ে মারা গেছে, ছেলেদুটো অন্যের বাড়িতে থাকে।

মাথার দোষ আছে বলেই সে কোনো কথা গোপন করতে পারে না। বিকেলের মধ্যেই জানা গেল যে ডাকাতির দায়ে সে দু'বছর জেলও খেটেছে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, একটা মুস্কো মতন জোয়ান, যার মাথার গণ্ডগোল আছে, সে আবার ডাকাতও বটে, এরকম এক-জনকে রাখতে হবে আমাদের বাড়িতে! মা তখনই ভয় পেয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাবা অবশ্য এতেও দমে যাবার পাত্র নন, স্বদেশী আমলে তিনি কিছুদিন জেল খেটেছিলেন, এখন জীবিকার তাড়নায় সদা ব্যস্ত হলেও মনের মধ্যে দেশ-দশের জন্য কিছুটা খচখচানি রয়ে গেছে।

বাবা বললেন, যে লোক নিজের থেকেই ডাকাতির কথা স্বীকার করে, তার মতো লোক খারাপ হতে পারে না। একবার একটা অপরাধ করে ফেললে কি আর ক্ষমা নেই? অত ভয় পাবার কী আছে?

এই ব্যাপারে অবশ্য আমি বাবার সঙ্গে এক মত। তাঁর ঐ যুক্তির জন্য নয়, লোকটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। কথাবার্তার মধ্যে পাগলাটে স্বরটা বেশ মজার। বাড়িতে আমরা তিনজন পুরুষ মানুষ, ওকে ভয় পাব কেন?

ওকে দিয়ে আধ-মন কয়লা ভাঙানো হল! একতলা থেকে

বালতি করে জল টেনে টেনে ধোওয়ানো হল পুরো ছাদটা। তাতে ওর কোনো আপত্তি নেই। মুখে হাসিটিও লেগে থাকে।

সারাদিন হারাধন এখানে সেখানে কাটায়, কাজ না থাকলে সদর দরজার বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্তিরে ওর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের ঘরে।

একঘরে বাবা-মা, এক ঘরে বোনেরা, আর কোথাও তো ওর জন্য জায়গা করা যাবে না। বসবার ঘরটাতেই দু'খানা খাটে কাকা আর আমি শুই। তারই এক পাশে হারাধনের জন্য একটা মাদুর আর বালিশ পাতা হল। হারাধনের সঙ্গে তো বিছানা-টিছানা কিছুই ছিল না। ও আগে শ্রীমানী মার্কেটের গাড়ি বারান্দায় তলায় শুয়ে থাকত।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটকাকার সঙ্গে এটা আমার আড্ডার সময়। ঘরের মধ্যে একটা উটকো লোক ঢোকাবার জন্য ছোটকাকা খুবই রেগে গেলেও কিছুই তো করার নেই। ছোটকাকার সামান্য দুটো টিউশনির রোজগার। হিটলারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস নেই ছোটকাকার।

ছোটকাকা চুরুট খায়, একটা লম্বা চুরুট শেষ না করা পর্যন্ত আমাদের গল্প চলে।

হারাধন তার মাদুরের ওপর বসে চোখ বুঁজে বিড়বিড় করে কী যেন জপ করতে লাগল। তার গলায় একটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা আগেই দেখেছি। সেটা তার ভিক্ষে করার ভেক মনে হয়েছিল। কিন্তু তার সত্যিই ভক্তি ভাব আছে দেখা যাচ্ছে।

চুরুট ধরিয়ে ছোটকাকা বলল, এই, তুই কী রকম ডাকাতি করেছিলি রে? মানুষ মেরেছিলি?

চোখ বোঁজা অবস্থাতেই জিভ কেটে সে বলল, আইজ্ঞে না বাবু, সে রকম অধর্ম করি নাই। সিন্দুক ভেঙেছি আর ধানের গোলা লুটেছি।

ছোটকাকা বলল, এগুলো বুঝি ধর্মের কাজ। একেবারে ধর্মপুত্তুর

যুধিষ্ঠির। শোন, এ বাড়ির বড়বাবু দয়া করে তোকে রেখেছেন। কোনো রকম চুরি-ডাকাতির মতলব যদি করিস, তা হলে মাথা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব।

হারাধন বলল, বড়বাবু তো আমারে মাটি-কাটার কাজ দেবেন বলেছেন। সেই কাজ আমি ভাল পারব।

ছোটকাকা আবার জিজ্ঞেস করলে, ডাকাতি করে কত টাকা পেয়েছিলি ?

এক গাল হেসে হারাধন বলল, কিছুই পাই নাই বাবু, ধরা পড়ে গেলাম যে।

হারাধন লম্বা করে গল্পটা বলার চেষ্টা করছিল, তাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিয়ে আমরা যে কাহিনীটা উদ্ধার করলুম, তাতে বোঝা গেল, ডাকাত হিসেবেও সে একটা অপদার্থ। খিদের ঠ্যালা সহ্য করতে না পেরেই সে একটা ডাকাতদের দলে ভিড়েছিল। প্রথমবারেই বনগাঁর এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে সে ধরা পড়ে যায়। পালাবার সময় একখানা রামদা ঘুরিয়ে বাড়ির লোকদের ভয় দেখানোই ছিল তার কাজ। হঠাৎ তার হাত থেকে রামদাটা ছিটকে পড়ে গেল দূরে। সেটা সে কুড়োতে যেতেই তিন চারজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

এমনই অদ্ভুত হাসি চোখে মুখে লাগিয়ে রেখে হারাধন গল্পটা বলে যায় যেন এটা তার জীবনের একটা দারুণ মজার অভিজ্ঞতা।

ধরা পড়ার পর সে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। তারপর পুলিশের হাতে মার খায়। জেল থেকে গ্রামে ফেরার পর তার পুরোনো স্যাঙাতরাও তার ভুলের জন্য তাকে বেধড়ক পিটিয়েছিল। একজনের শাবলের কোপে তার পায়ের দুটো আঙুল উড়ে যায়।

বাঁ পা তুলে সে তার পুরোনো ক্ষতস্থানটা দেখাবার চেষ্টা করতেই ছোটকাকা বলল, থাক থাক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ঐ একবারই ডাকাতি করেছ ? তার আগে চুরি-টুরি করনি দু' একবার ?

হারাধন বলল, খেজুর রস চুরি করিছি অল্প বয়েসে। তারপর ধরেন কখনো খিদের জ্বালায় লোকের বাড়ি থেকে কলাটা-মূলোটা নিয়েছি, কিন্তু টাকা-পয়সা—

কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সে ছোটকাকার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর বলল, ওটা কী?

ছোটকাকা বললে, এটা চুরুট। তুই কখনো চুরুট দেখিসনি?

দুদিকে মাথা নেড়ে সে বললে, আইজ্ঞে না।

তারপর চিন্তিত ভাবে প্যাঁচার মতন দু'একবার চোখ পাল্টে বলল, হ্যাঁ, দেখিছি বোধহয় একবার। জেলখানার এক বাবুর মুখে। ওডা কেমন লাগে? হুঁকোর মতন!

লোকটা খোসা ছাড়ানো সাদা চীনে বাদাম দেখেনি। চুরুট দেখলে অবাক হয়, এ কেমন ধরনের গেঁইয়া? এমন গ্রামও আছে এখনো? হুঁকোর মতন শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল।

ছোটকাকা জিজ্ঞেস করল, তুই গাঁজা খেয়েছিস কখনো?

সে উত্তর না দিয়ে বলল, বাবু, আমারে একখানা দেবেন? একবার টেনে ছাখব? জীবনটা ব্রেথা যাবে! ছান না!

ছোটকাকা আর আমি স্তম্ভিত হয়ে চোখাচোখি করলুম।

বাড়ির একটা চাকর, তাও সদ্য নতুন, বাড়ির বাবুদের কাছে সিগারেট কিংবা চুরুট চাইছে, এ কখনো কেউ শুনেছে?

ছোটকাকা তো বাবারই ছোট ভাই, সেও কম রাগী নয়! সে হুংকার দিয়ে বলল, একটা লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেব। বেশি বেশি আবদার পেয়েছিস তাই না?

হারাধন হি হি করে হেসে বলল, মারেন, মারেন, যত জোরে ইচ্ছা মারেন। লাথি আমি অনেক খাইছি, তাতে আমার বেশি লাগে না। কিন্তু ঐ লম্বা তামুক কখনো খাই নাই। জীবনে একবার খাইয়া ছাখব না? ছান ছোটবাবু, একবার ছান।

পাগল না হলে কেউ এই ভাবে চাইতে পারে না।

এমন ভাবে চাইলে না-ও বলা যায় না।

গলায় ধোঁয়া আটকে ছোটকাকা একবার বিষম খেল। তারপর তিন-চতুর্থাংশ শেষ হয়ে আসা চুরুটটা সে ছুঁড়ে দিল হারাধনের দিকে।

বাবুদের সামনে যে ধূমপান করতে নেই, সে জ্ঞানটুকু আছে হারাধনের। চুরুটের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ধাড়ী হনুমানের মতন লাফাতে লাফাতে চলে গেল বাইরে।

একটু বাদে ফিরে এসে সে ঢিপ করে প্রণাম করল ছোটকাকার পা ছুঁয়ে।

গদগদ ভাবে বললো, জীবনটা ধন্য হলো গো ছোটবাবু! এমন সরেশ বস্তু কোনোদিন খাই নাই। গলার মইধ্যে কী আরাম!

প্রায় লাথি মারার ভঙ্গিতেই বিরক্ত হয়ে পা সরিয়ে নিল ছোট-কাকা।

পরবর্তী তিন-চারদিন হারাধনকে নিয়ে বেশ হৈ হৈ করেই কাটল। প্রায়ই তাকে নিয়ে মজা করা যায়। আমরা গ্রামে বিশেষ থাকিনি. হারাধনের কাছ থেকে আমরা গ্রামের সব অদ্ভুত গল্প শুনি। অবশ্য গ্রামের সব লোকই নিশ্চয়ই হারাধনের মতন অজ্ঞ হয় না।

বাবা একদিন গোটা চারেক মাগুর মাছ আনলেন বাজার থেকে। তার মধ্যে একটা দুরন্ত মাগুর হঠাৎ বাজারের থলে থেকে লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। কাঁটার ভয়ে কেউ সেটাকে ধরতে সাহস পাচ্ছে না। মা বললেন, ও হারাধন, মাছটা তুলে আন।

মাছ ধরবে কি, হারাধন ড্যাবডেবে চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে। ফিসফিস করে বলল, এত বড় মাগুর? জন্মে দেখি নাই।

কথাটা আমাদের খুব বাড়াবাড়ি মনে হল। মাগুরটা পেল্লায় কিছু না, বাজারে এই রকম মাগুরই তো বিক্রি হয়, এক বিঘতের চেয়ে একটু লম্বা। গ্রামের লোক একটা এরকম মাগুর দেখেনি?

বাবা বললেন, কলকাতার বাজারে বেশির ভাগই চালানী মাগুর আসে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের গ্রামে বেশি বড় মাগুর হয় না। ছোট থাকতেই ধরে খেয়ে ফেলে।

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। যা কলকাতার বাজারে সারা বছর পাওয়া যায়, তা একজন গ্রামের মানুষ সারা জীবনে একবারও দেখেনি? এ কি হতে পারে?

হারাধন মহা বিস্ময়ের সঙ্গে সেই মাগুর মাছ কোটা দেখতে লাগল রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে। এক সময় সে বলে ফেলল, মা, আমারে এক টুকরা দেবেন তো?

মা ধমক দিয়ে বললেন, যা রান্না হয়, তার কোন্‌টা তোমাকে দেওয়া হয় না? এখানে বসে বসে নজর দিতে হবে না, ওঠো তো!

দু'দিন বাদে হারাধনের একটা চুরি ধরা পড়ে গেল।

দুপুরের দিকে মা একটু ঘুমিয়ে নেন। আমারও দুপুরের ঘুম বেশ প্রিয়। যতদিন চাকরি পাচ্ছি না, ততদিন দুপুরের ঘুমটা আর ছাড়ি কেন? ছোটকাকা টো-টো- করে ঘুরে বেড়ায়।

ছোড়দি এসে ঠ্যালা মেরে আমায় জাগিয়ে বলল, খোকন, এই খোকন, দেখবি আয়!

ছোড়দির মুখে ঠিক ভয় নয়, অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের ঘোর। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমাকে শব্দ না করার ইঙ্গিত করে ছোড়দি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

নিভে যাওয়া উনুনের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের দুধের কড়াইটা চাপানো। আধকড়াই ভর্তি দুধের ওপর একটা পাতলা সর পড়েছে। একটা মস্ত হুলো বেড়ালের মতন উপুড় হয়ে হারাধন সরাসরি সেই কড়াই থেকেই চুমুক মারছে দুধে।

আমাদের উপস্থিতিতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই!

আমি চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুললুম। তার গোঁফ-দাড়িতেও দুধ লেগে গেছে।

ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই তার মুখে। বরং একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বলল, দশ-বারো বছর দুধ খাই নাই! কেমন খেতে লাগে ভুইলেই গেছিলাম। তাই একটু ইচ্ছে হল···

আমি নিজেও তো দশ-বারো বছর চুমুক দিয়ে দুধ খাইনি। চায়ের সঙ্গে যে-টুকু দুধ পেটে যায়, দুধের সঙ্গে সেইটুকুই সম্পর্ক!

দাঁত কিড়মিড় করে আমি বললুম, হারামজাদা? আমাদের বাড়িতে একেবারে ছোট বোনটা ছাড়া আর কে দুধ খায়? বাকি দুধটা তো চায়ের জন্য।

ছোড়দি বলল, ভাগ্যি আমি দেখে ফেললুম! নইলে ওর এঁটোটা আমাদেরকে খেতে হত।

হারাধন বলল, বড় ভাল সোয়াদ? আর একটু খাব ও দিদিমনি! খাবো?

সেইদিনই হারাধনের চাকরি যাবার কথা।

কিন্তু ছোড়দির দয়ার শরীর। প্রথম অপরাধের জন্য ছোড়দি তাকে ক্ষমা করে দিতে চাইল। ঘটনাটা কাউকে জানানো হল না। হারাধনের এঁটো দুধ রেখে দেবারও কোনো মানে হয় না। পুরো দুধটাই হারাধনকে দিয়ে বলা হল, সে যদি ভবিষ্যতে আর কোনো খাবারে মুখ দেয় কিংবা না বলে কোনো জিনিস নেয়, তাহলেই পুলিশে দেওয়া হবে তাকে।

আনন্দে চোখ চকচক করে উঠলো হারাধনের। পুরো কড়াইটা দু'হাতে তুলে প্রায় এক চুমুকে সাবাড় করে দিল পুরো দুধ। আঙুলে সর তুলে চেটে চেটে খেল আর মুগ্ধভাবে তাকাতে লাগলো ছোড়দির দিকে।

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ছোড়দিকে প্রণাম জানিয়ে বলল যে আর কখনো সে না জানিয়ে কিছু খাবে না!

কড়াইটা উল্টে দোষ দেওয়া হল পাশের বাড়ির পোষা বেড়ালটার নামে।

এরপর কয়েকদিন ছোড়দি আর আমি পালা করে দুপুরবেলা গোপনে লক্ষ্য করেছি। হারাধনের আর কোনো চৌর্যকর্ম চোখে পড়েনি।

গৌতমকাকা বাবার চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসে একটা দুঃসংবাদ দিলেন।

সরকারের কাছে তাঁর আড়াই লাখ টাকা বিল বাকি পড়ে আছে, তাঁর মাটি-কাটার ব্যবসা আপাতত লাটে উঠে গেছে। মজুরদের প্রাপ্য টাকা দিতে পারছেন না বলে তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

হারাধনকে দেখে তিনি মুখ বাঁকিয়ে বাবাকে বললেন, এরকম একটা মুস্কো জোয়ানকে বাড়িতে রেখেছ, তুমি কি পাগল নাকি? আজই একে বিদায় করে দাও। দিনকাল খারাপ, কখন কিসে কী সর্বনাশ হয়ে যায়, কোনো ঠিক নেই।

হারাধনকে অবশ্য তখনই তাড়ানো হল না। পাগলাটে মানুষটা এমনিতে নিরীহ, হাজার ধমক দিলেও প্রতিবাদ করে না। মাঝে মাঝে জিনিসপত্র ভাঙে, এর মধ্যে দুটো কাঁচের গেলাস আর একটা কাপ ভেঙেছে: দোকান থেকে কোনো জিনিস আনতে বললে অন্য একটা নিয়ে আসে। তবু কোনো কাজেই তার না নেই। আমাদের ঠিকে ঝি-টা আবার দিন চারেক ধরে আসছে না।

এমনকি মা-ও হারাধনকে একটু একটু পছন্দ করে ফেলেছেন। হারাধনের এক-একটা অদ্ভুত কথা শুনে তিনি হেসে গড়াগড়ি যান! ছোড়দির বান্ধবীরা বেড়াতে এলে ছোড়দি হারাধনকে ডেকে তার বোকামির নিদর্শনগুলি দেখিয়ে বান্ধবীদের আনন্দ দেয়।

একদিন একটা গায়ে মাখা সাবান কিনে আনার জন্য ওকে একটা দশ টাকার নোট দেওয়া হলো। তা দিয়ে ও সাবানের বদলে নিয়ে এলো চারখানা ফজলি আম। চোখ বড় বড় করে সগর্বে বললো, দ্যাখেন কত বড় আম আনছি। এত বড় আম বাপের জন্মে দেখি নাই!

সেদিন ছোড়দি পর্যন্ত রেগে কাঁই। ছোড়দি তখন বাথরুমে, সাবানের অপেক্ষায়।

ছোটকাকা হারাধনের কান ধরে টানতেই সে মুচকি হেসে বললো, আমারে আধখান আম দেবেন তো?

দিন পনেরো কেটে যাবার পর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল।

সেদিন রবিবার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাবা পাশের বাড়িতে তাস খেলতে যান। মা খবরের কাগজের রবিবারের পাতা শেষ করে বেলা করে ঘুমোন। হঠাৎ দরজায় একটা আওয়াজ পেয়ে মা ভাবলেন, কোনো কারণে তাস খেলা বন্ধ, তাই বাবা আজ ফিরে এসেছেন।

বিছানায় তার পাশে একজনের শুয়ে পড়ার শব্দ হল। অন্য দিকে ফিরে কাগজ পড়তে পড়তে মা জিজ্ঞেস করলেন, আজ আর খেলা হল না বুঝি? তোমাকে কতদিন বলেছি, সুমিতা পছন্দ করে না···

উত্তরের বদলে একটা অন্যরকম হাসির শব্দ শুনে মা চমকে পাশ ফিরলেন। তিনি দেখলেন দাড়িগোঁফওয়ালা একটা বিকট মুখ, সেই মুখখানা খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

বিরাট আর্তনাদ করে মা পালাবার চেষ্টা করতেই গড়িয়ে পড়ে গেলেন খাট থেকে।

আরশোলা দেখে ভয় পায় ছোড়দি। মায়ের ওসব বাতিক নেই। এমনকি মায়ের ভূতের ভয়ও নেই। মার গলায় ওরকম চিৎকার আমরা কখনো শুনিনি!

আমরা সবাই ছুটে গেলুম এক সঙ্গে।

খাটের ওপর, ঠিক পাখার নিচে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে হারাধন। খাটের গদিতে সে একটু একটু দোলবার চেষ্টা করছে।

একটা ক্রিকেট ব্যাট তুলে ছোটকাকা যেভাবে মারতে উঠেছিল, সেটা ঠিক মতন লাগলে হারাধন বোধহয় তক্ষুনি খুন হয়ে যেত। ছোড়দি ছোটকাকার হাতটা ধরে ফেলল।

তারপর চলল লাথি-ঘুঁষি।

হারাধনের মুখে একটিও শব্দ নেই। যেন সে ধরেই নিয়েছে এই সব মার তার প্রাপ্য। কোনো প্রশ্নেরও সে উত্তর দেয় না। লোকটার অকৃতজ্ঞতাতেই আমাদের সকলের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে

ঘৃণা। একটা জেলখাটা ডাকাত জেনেও ওকে এবাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, তার এই প্রতিদান!

মায়ের ধারণা, হারাধন ওঁর গলা টিপে ধরতে চেয়েছিল!

খবর পেয়ে বাবা ছুটে এলেন পাশের বাড়ি থেকে। এখন বাবাকে সামলানোই একটা বড় কাজ আমাদের। বাবার খুব ব্লাড প্রেশার আছে।

বাবা কিন্তু রাগারাগি করলেন না একেবারেই। গুম হয়ে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। তাঁর মুখে নিদারুণ দুঃখের ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন খুব অন্যায়ভাবে তাঁকে কেউ কোনো একটা খেলায় হারিয়ে দিয়েছে।

আমার মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে হারাধন শুয়েছে, এই কথাটা জানাজানি হয়ে গেলেই পাড়ার লোক অনেক কথা বলতে পারে। তারপর কী ঘটেছে না ঘটেছে, তা কেউ শুনতে চাইবে না। যাদের জিভ সব সময় শুলশুল করে, তারা যা ইচ্ছে বানাবে।

এই ব্যাপারটা ছোড়দি বুঝতে পেরে বলল, বাবা, আর চ্যাঁচামেচি করার দরকার নেই। ওকে বরং বনগাঁয় পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

বাবা যুক্তিটা মানলেন। ছোটকাকা আর আমার ওপর সেই ভার দেওয়া হল।

হারাধনের দিকে তাকিয়ে বাবা শুধু গম্ভীরভাবে বললেন, তুই আর কোনোদিন কলকাতা শহরে ভিক্ষে করতেও আসবি না। তাহলে কিন্তু কেউ আর তোকে বাঁচাতে পারবে না।

শিয়ালদায় পৌঁছে হারাধনের কাছে আমাকে পাহারায় দাঁড় করিয়ে ছোটকাকা গেল টিকিট কেটে আনতে।

মার খেয়ে হারাধনের মুখ ফুলে গেছে। থুতনির কাছে তার কেটেও গেছে খানিকটা। কিন্তু তাকে মোটেই বিমর্ষ দেখাচ্ছে না। বরং বনগাঁয় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সে যেন বেশ উৎফুল্ল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হারাধন, সত্যি করে বল তো, তুমি এটা

করতে গেলে কেন? মা তোমাকে কোনোদিন কম খাবার দিয়েছে? তোমাকে একটা জামা কিনে দেওয়া হল পরশুদিন।

হারাধন বলল, জামা তো আমার একটা ছিলই। আর জামা লাগতো না!

আমি বললুম, তোমার জামাটা ছেঁড়া আর নোংরা। সেই জন্যই একটা নতুন জামা দেওয়া হল। ছোড়দি সেদিন…

হারাধন আবার বলল, জামা লাগতো না। কিন্তু আমি কোনোদিন গদির বিছানায় শুই নাই। মাথার উপরে পাখা ঘোরে, গদির বিছানা, কেমন লাগে তাই তো জানি না! তাই ভাবলাম, জীবনটা ব্রেথা যাবে, কোনোদিন শোব না? তাই একটু বড়বাবুর মতন…হে হে হে, বড় ভাল লাগছে! একটু মার খেয়েছি, তাতে কী হয়েছে, বড় ভাল লেগেছে গো বাবু!

আমার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল পরম পরিতৃপ্তিতে।

চক্ষু বোজা চক্ষু খোলা

লঞ্চ থেকে নেমে বালির ওপর দাঁড়িয়ে প্রবীর মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগলো, তার শরীরে রোমাঞ্চ হলো।

শেষ বিকেলের লাল রঙের আলোয় সামনের প্রান্তরের শূন্যতা যেন সাধারণ শূন্যতার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। শূন্যতা বাতাসে উড়ছে, শূন্যতা মাটিতে শুয়ে আছে।

প্রবীর বছর চারেক আগে একবার এখানে এসেছিল। সরকারি অফিসার হিসেবে নয়, বন্ধুদের সঙ্গে দল মিলে। তখন এখানে ছিল অসংখ্য তাঁবু আর হোগলার ঘর। চতুর্দিকে গিসগিস করছে মানুষ, অনেকে মাথার ওপর ছাউনি পায়নি। শীতের মধ্যে থেকেছে খোলা আকাশের নীচে। সেবারের মেলায় সাত লাখ তীর্থযাত্রী এসেছিল।

সেই জায়গাটাই এখন সম্পূর্ণ নির্জন। গা ছমছম করে।

লঞ্চ থেকে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে, প্রবীর পেছন ফিরে তাকালো। সমুদ্র এখন রক্তবর্ণ, ঢেউ বিশেষ নেই। একেবারে দিগন্তে একটা স্থির জাহাজ; কোলরিজের কবিতার মতন, চিত্রিত সমুদ্রে একটা জাহাজের ছবি।

ভিজে বালির ওপর দৌড়োদৌড়ি করছে ছোট ছোট কমলা রঙের কাঁকড়া। অসংখ্য। প্রবীর দু'পা এগোতেই চোখের নিমেষে তারা মিলিয়ে গেল! প্রবীর আবার স্থির হতেই তারা গর্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্বদেশ সেনগুপ্ত চেঁচিয়ে বললেন, চেষ্টা করে ছাখ, যদি একটাও ধরতে পারিস। এক বোতল স্কচ দেবো!

প্রবীর চেষ্টা করলো না। সে জানে, খালি হাতে ওদের ধরা যায় না। ঐ টুকু টুকু প্রাণী, অথচ ওদের এত সূক্ষ্ম চোখ আর কান?

সন্ধের সময় ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে কি গায়ে সূর্যের রং লাগাবার জন্য!

বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ওরা এগিয়ে গেল ডাক বাংলোর দিকে।

এই বাংলোটি একেবারে নতুন। এখানে টাটকা চুনকামের গন্ধ নাকে আসে। জানলা দরজার রং দেখলে মনে হয় শুকোয়নি।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্বদেশ সেনগুপ্ত ভেতরে ঢুকেই বাথরুমের কল খুলে দেখলেন। কমোডের ফ্লাস টানলেন। তারপর গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বললেন, আমি তো কলের মিস্তিরি। আগেই এদিকে নজর পড়ে। হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিকই আছে! আজ আর কি কিছু কাজ হবে?

সুখেন বললো, স্যার, এখন একটু চা খেয়ে নেবেন? সঙ্গে টোস্ট আর টিনের সার্ডিন মাছও আছে।

স্বদেশ সেনগুপ্ত একটু বেশি লম্বা, তাই তাঁকে ল্যাকপেকে দেখায়। কথা বলার সময় মাথাটা দোলে। বিস্ময়, রাগ, খুশীর রেখাগুলো তাঁর মুখে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তিনি ভুরু তুলে বললেন, টিনের মাছও এনেছো নাকি?

সুখেন বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। যা চাইবেন সব পাবেন।

স্বদেশ বললেন, ধুস! সমুদ্রের ধারে এসে টিনের মাছ। কাল সকালে টাটকা মাছ জোগাড় করা চাই। মাছের নৌকা যায় এদিক দিয়ে। এখন চায়ের সঙ্গে মুড়ি মাখো, বেশ বাদাম-টাদাম দিয়ে, পাঁপড় ভেজে গুঁড়ো করে, আর কাঁচা লংকা!

লঞ্চ থেকে শেষ দুটো প্যাকেট বয়ে নিয়ে এসে নিখিল বললো, এক ব্যাটা সাধু এর মধ্যেই এসে গেছে!

স্বদেশ যেন একটা দুঃসংবাদ শুনে চমকে ওঠার মতন বললেন, এর মধ্যেই আসতে শুরু করেছে? এখনো তো দু'সপ্তাহ দেরি আছে।

নিখিল বললো, ঐ একজনকেই তো দেখলুম। প্রথমে মনে

হয়েছিল, বুঝি একটা পাথর। কাছে গিয়ে দেখি বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা এক জটাধারী চোখ বুজে বসে আছে।

স্বদেশ বললেন, ওদের আর কি! যে-কোনো এক জায়গায় বসে গেলেই হলো।

দু' সপ্তাহেরও বেশি, আরও উনিশ দিন বাকি আছে চৈত্র সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে। কপিল মুনির আশ্রম এখনো খোলেনি, অযোধ্যা থেকে মোহান্ত পাণ্ডারা এখনো এসে পৌঁছোয়নি।

পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অফিসারদের এই দলটি আজ এসেছে আগে থেকেই পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি ব্যবস্থার পরিদর্শন করতে। এই কাজে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের আসার এখনই কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি স্বয়ং এসেছেন বলে তাঁকে খাতির করাটাই অন্যদের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও কাজের মানুষ। কাজ ভালোবাসেন।

সুখেন আর দু'জন এসেছে কণ্ট্রাকটারদের প্রতিনিধি হিসেবে। আপাতত তাদের কাজ এই ছোট দলটির সেবা-যত্ন করা। বাঘের পেছনে ফেউয়ের মতন, সরকারি অফিসাররা বাইরে সফরে গেলে তাদের সঙ্গে কণ্ট্রাকটাররা থাকবেই। এক এক সময় কে বাঘ আর কে ফেউ, তা ঠিক বোঝা যায় না।

স্বদেশ সেনগুপ্ত ছটফটে মানুষ। চা তৈরি করতে দেরি হচ্ছে বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল প্রবীর। পুরো অন্ধকার হবার আগে একবার সাইটটা ঘুরে দেখে আসি। গ্রাউণ্ড প্ল্যানটা নিয়ে নে। টর্চ এনেছিস তো?

জুনিয়ার অফিসারদের তুই-তুকারি করার নিয়ম নেই। কিন্তু স্বদেশ কারুর কারুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেন, তাদের বাড়িতে যান, অসুখ বিসুখ হলে খোঁজ খবর নেন, তিনি স্বদেশদা হয়ে যান।

বাইরের অন্ধকার আকাশের রঙ অনেকটা খেয়ে ফেলেছে। সমুদ্রের ওপর লাফ দিয়ে নামছে অন্ধকার। এখন বেশ জোরে বাতাস বইছে।

প্রবীর আর নিখিলকে নিয়ে স্বদেশ ঘুরতে লাগলেন কোথায় কোথায় জলের কলগুলো বসবে তা নির্দেশ করার জন্য। এর মধ্যেই একবার ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়ে গেছে, সমুদ্র-বাতাসের লবণ গন্ধের সঙ্গে সেই গন্ধ মিশে যায়।

এক সময় নিখিল বললো, ঐ যে দেখুন সেই সাধু!

তিনজনে এগিয়ে গেল কাছে।

একেবারে উলঙ্গ নয়, একটা সরু ল্যাঙোট পরে আছেন সাধুটি। কালো শরীরে ছাই মাখা, বেশ সবল দেহ, মাথা ভর্তি জটা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে পদ্মাসনে বসে আছেন, চক্ষুদুটি বোজা।

স্বদেশ বললেন, চেহারাখানা বেশ ইম্প্রেসিভ। খাঁটি সাধু সাধু দেখতে। তাই না?

নিখিল বললো, এই ব্যাটা গত বছর থেকেই বোধহয় এখানে রয়ে গেছে।

প্রবীর বলল, আস্তে। ব্যাটা ব্যাটা বলবেন না, শুনতে পাবে।

নিখিল বললো, শুনলেও বাংলা বুঝবে না।

স্বদেশ বললেন, হিন্দিতে ব্যাটা মানে খারাপ কিছু নয়। আচ্ছা, এই সাধু মহারাজ খায়দায় কি। এখানে কে ওকে খাবার দেবে? অথচ শরীরখানা বেশ তাগড়াই।

নিখিল বললো জিজ্ঞেস করবো?

স্বদেশ বললেন, না, না, থাক। ধ্যান ভাঙালে যদি পাপ টাপ হয়।

প্রবীর স্বদেশের দিকে তাকিয়ে, একটু দ্বিধা করে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি এসব মানেন?

স্বদেশ থুতনিতে হাত দিয়ে দ্বিধার সঙ্গে বললেন, মানি না বোধহয়, ঠিক বুঝিই না। তবে ভয় পাই। এদের দেখলেই একটা আনক্যানি ফিলিং হয়। এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বসে আছে।

স্বদেশের পরনে টাই-বিহীন উলের স্যুট, নিখিল আর প্রবীরের গায়ে ফুল হাতা মোটা সোয়েটার। এখন বাতাসের বেগ বেড়েছে বলে তাতেও শীত শীত লাগছে।

নিখিল হাল্‌কাভাবে বললো, হয়তো এই সাধুই স্বয়ং কপিলমুনি। বছরের এই টাইমে মাটির তলা থেকে উঠে আসেন একবার করে। কপিলমুনি তো অমর।

স্বদেশ বললেন, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যস…সাতজন অমর কারা কারা যেন ?

প্রবীর বললো, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ আর পরশুরাম, এই সপ্তেতে চিরঞ্জীবীনঃ।

স্বদেশ বললেন, এই লিস্টে নাম না থাকলেও কপিলমুনিও বোধ-হয় অমর। নিখিল ঠিকই বলেছে। পরশুরাম মাঝে মাঝে কপিল-মুনির সঙ্গে দেখা করতে আসে না ?

তারপর গলা নিচু করে স্বদেশ আবার হাসতে হাসতে বললেন, এই সাধুবাবাটি কপিলমুনিও হতে পারে অথবা নর্থ বিহারের কোনো খুনিও হতে পারে।

অদূরে এই তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও সাধুটির চোখের পাতা একবারও খোলেনি, শরীরও একটুও নড়েনি।

একজন বেয়ারা সঙ্গে নিয়ে সুখেন সেখানে চায়ের পট, কাপ ও এক গামলা মুড়ি-মশলা নিয়ে উপস্থিত হলো।

সে বিগলিত ভাবে বললো, স্যার, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখানেই খেয়ে নিন না।

স্বদেশ এক খাবলা মুড়ি তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ বেশ হয়েছে। নুন একটু কম দিলে পারতে।

নিখিল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সাধুজী, চায়ে পিয়েঙ্গে ?

কোনো উত্তর এলো না।

সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই নির্জনে চোখ বুজে বসে আছে যে সাধু, সে নিশ্চয়ই ভিক্ষের প্রত্যাশী নয়। চা খেতে সাধুদের কোনো

নিষেধ নেই, পরিতোষ অনেক সাধুকে তা খেতে দেখেছে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে একটু চা খেলে ভালো লাগবার কথা, তবু সাধুটি লোভ করলো না।

এর সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াটাও প্রবীরের ভাল্‌গার মনে হলো। সে বললো, চলুন স্বদেশদা, আমরা বাংলোয় যাই!

স্বদেশ বললেন, একটু সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসা যাক বরং।

কিন্তু সমুদ্রতীর বেশিক্ষণ উপভোগ্য হলো না। এ বছর বেশ জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে। অবশ্য, কলকাতায় এরকম ঠাণ্ডা টের পাওয়া যায় না। বাতাস এমন প্রবল যে সিগারেট টানারও উপায় নেই।

বাংলোতে বিদ্যুতের আলো আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে স্বদেশ তার সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের বিষয় আলোচনা করলেন, তারপর হঠাৎ কাগজপত্র ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এনাফ! কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। এখন একটু তাস খেলা যাক। কে কে ব্রীজ খেলবে?

খাটের ওপর বসে তাস বাঁটতে বাঁটতে স্বদেশ বললেন, ঠাণ্ডায় একেবারে কালিয়ে গেলুম। শরীর গরম করার কিছু আছে নাকি?

সুখেন বললো, আছে স্যার। সব রকম স্টক আছে। গেলাস আনছি।

সুখেন বেশ গর্বের সঙ্গে এক বোতল স্কচ এনে রাখলো বিছানার ওপর। গেলাস, সোডা এবং বরফও এলো। সত্যি সুখেনের আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই।

প্রবীর ভাবলো, গ্রেট ব্রিটেনের একটা ছোট্ট জায়গার বিশেষ ধরনের জল দিয়ে তৈরি হয় এই মদ। অন্য জলে সেরকম স্বাদ হয় না। ওরা কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বোতল বানায়? পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সন্ধের পর কত লোক এই স্কচ পান করে, এমনকি গঙ্গাসাগরের মতন এমন রিমোট জায়গাতেও একটি বোতল উপস্থিত।

স্বদেশ বোতলটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে

বললেন, আজকাল খুব ভ্যাজাল হয়। শালারা বোতলের তলা দিয়ে গরম সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে নাকি স্কচ বার করে নেয়।

গেলাসে একটুখানি র ঢেলে তিনি মুখে দিলেন, ওয়াইন টেস্টারের ভঙ্গিতে জিভে ঘোরাতে লাগলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

প্রবীর বললো, স্বদেশদা, আপনি আগে খেলেন কেন? যদি বিষাক্ত হতো?

স্বদেশ হা-হা করে হেসে বললেন, ঐ যে গান আছে না, আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান! তোরা বাচ্চা ছেলে, তোদের সামনে অনেকখানি কেরিয়ার পড়ে আছে, কত ল্যাং মারামারি, কত চুকলি কাটা, কত মিনিস্টারের ইয়েতে তেল দেওয়া···

সবাই জানে, বেশি পান করার দরকার হয় না, মদের বোতল দেখলেই স্বদেশ সেনগুপ্তর নেশা শুরু হয়ে যায়। মদ্যপানের আড়ম্বরটাই উনি পছন্দ করেন, নিজে বেশি খেতে পারেন না, খেতে চানও না। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দু' পেগ খাবেন এবং প্রচুর বকবক করবেন।

খানিকবাদে হঠাৎ এমন জোর মেঘ ডেকে উঠলো যেন কাছেই কামান দাগা হয়েছে। স্বদেশই বললেন, জাহাজ থেকে কামান দাগছে নাকি রে?

নিখিল বললো, না বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

স্বদেশ বললেন, শীতকালে এমন তেজি মেঘ! জানিস এক সময় এখানে সত্যি সত্যি কামান দাগা হতো!

নিখিল বা প্রবীররা এ খবর নিশ্চয়ই জানে না। তাদের কৌতূহলী চোখ দেখে স্বদেশ আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, এই জায়গাটা তো সুন্দরবনের সঙ্গে কানেকটেড ছিল এক সময়। প্রচুর বাঘ আসতো। গঙ্গাসাগর মেলার সময় বাঘের হামলায় অনেক মানুষ মরতো। বাঘেদের ফিস্ট লেগে যেত। বঙ্কিমবাবুর ঐ যে নভেলটা, কী যেন নাম, কাপালিক আর ফুলের গয়না পরা মেয়ে, হ্যাঁ, কপালকুণ্ডলা,

তাতে নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে ভেবে সবাই পালালো মনে নেই? একসঙ্গে এখানে কতগুলো বাঘ আসতো ভেবে ছাখ, যে একবার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বাঘ তাড়াবার জন্য এখানে কামান বসিয়েছিল, তার ডকুমেন্ট আছে।

এর মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল প্রবল তোড়ে।

স্বদেশ বললেন, জানলা বন্ধ কর! শীতকালে এমন বৃষ্টি বাপের জন্মে দেখিনি! নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশানের ধাক্কায় ওয়েদার-ফোয়েদার সব গুবলেট হয়ে গেছে!

নিখিল বললো, গত বছর মেলার মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল মনে আছে? অনেকগুলো তাঁবু উল্টে গেল, লোকগুলোর কী অবস্থা! কলেরা আর ঠাণ্ডায় লাস্ট ইয়ারে প্রায় সত্তরজন ক্যাজুয়ালটি! মেলায় এত সাধু-সন্ন্যাসী আসে, সব ব্যাটার খালি পয়সা মারার ধান্ধা, ধ্যান-করে যে বৃষ্টি আটকাবে, সে হিম্মৎ নেই কারুর।

স্বদেশ বললেন, কলিকালে আর ব্রহ্মতেজ নেই। সব মন্দা। রাজার দোষে প্রজা নষ্ট! পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর স্বার্থের লড়াইতে বুরোক্রাট, টেকনোক্রাটরা সব হাত গুটিয়ে বসে আছে, দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে!

প্রবীর বলল, স্বদেশদা, ঐ সাধুটি বৃষ্টিতে ভিজছে। ওকে এখানে ডেকে আনলে হয় না?

স্বদেশ বললেন, তুই কি ভাবছিস, এ বৃষ্টির মধ্যে সে এখনো বসে আছে? মাথা খারাপ তোর! ও নিশ্চয়ই মন্দিরে ঢুকে পড়েছে, কিংবা ওর ঠিক থাকার জায়গা আছে। ওকি চব্বিশ ঘণ্টা ওখানে চোখ বুজে বসে থাকে? ইম্‌পসিবল্‌। না খেলে শরীর টেঁকে না, না ঘুমোলে মানুষ বাঁচে না। সাধুই হোক আর যেই হোক। সাধুরা নেচারস কল-এ যায় না?

প্রবীর বললো, একবার দেখে আসবো?

সবাই হেসে উঠলো।

নিখিল বললো, আপনার দেখছি মশাই খুব রস! আপনার কি ওদের ওপর খুব ভক্তি আছে নাকি? সব কটা বুজরুক।

স্বদেশ বললেন, দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকা ভালো। তাতে তাড়াতাড়ি চাকরির উন্নতি হয়। তবে কি জানিস প্রবীর, একবার দ্বারভাঙ্গায় গেসলুম, আমার বন্ধু বিষ্ণুপ্রসাদ ওখানকার কমিশনার ছিল। তার মুখে শুনেছি, ওদিককার গ্রামে প্রায়ই রাগের মাথায় কেউ আর একজনকে খুন করে। তারপর সেই খুনী পালিয়ে গিয়ে গায়ে ছাইভস্ম মেখে সাধু সেজে যায়। সাধু হলে তো আর পুলিশে ছোঁবে না। সেই ভাবে আট-দশ বছর এদিক-ওদিক ঘুরে আবার গ্রামে ফিরে আসে। তখন পুরোনো কথা সবাই ভুলে যায়। আজকের সাধু বাবাটির যা চেহারার বহর দেখলুম, তাতে মার্ডারার হওয়া নট আনলাইকলি!

প্রবীর বললো, সাধু সাজতে গেলেও এতখানি কঠোর সাধু হতে হবে কেন? ঐ লোকটা যদি এমনি এক জায়গায় বসে গাঁজা টানতো, তা হলেও তো ওকে আমরা ডিসটার্ব করতুম না। শীতের মধ্যে ওরকম খালি গায়ে বসে থাকা···অনেক সাধু তো গায়ে কম্বল দেয়।

নিখিল বললো, আমাদের ইম্প্রেস করার চেষ্টা করছে। লঞ্চটা আসতে দেখেই ভড়ং শুরু করেছে, সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট।

প্রবীর বললো, ওকে ডেকে এনে জেরা করলে হয় না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। খুনী হলে আমরা ধরে ফেলতে পারবো না?

স্বদেশ বললেন, আমরা ওসবে মাথা ঘামাতে যাবো কেন বল! আমরা তো পুলিশ নই! আমাদের সে রকম কোনো পাওয়ার নেই।

সুখেন বললো, ঠিক বলেছেন স্যার! ওসব সাধু-টাধুদের নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করার দরকার নেই। কিসে কী হয়ে যায়, বলা তো যায় না। কিছু কিছু সাধু জেনুইন আছে স্যার, আমি দেখেছি, ইন মাই ওউন আইজ, এই মেলায় কয়েকজন সাধু দিনের পর দিন এক জায়গায় বসে থাকে, একবারও ওঠে না। জল ছাড়া কিছু খায় না।

নিখিল বললো, পেচ্ছাব-পাইখানাও করে না? সব হজম করে ফেলে? আরে বাবা, শুধু জল খেলেও তো পেচ্ছাব করতেই হবে।

স্বদেশ বললেন, হ্যাঁ, এবারে ল্যাট্রিন করবে, মেয়েদের জন্য আলাদা ল্যাট্রিন বেশি করে বানিও, ভালো করে ঢেকে দিও। গতবারে মহিলারা ওপন্ এয়ারে,···সে বড় বীভৎস দৃশ্য, আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না।

কথা অন্যদিকে ঘুরে গেলেও প্রবীরের মাথায় ঐ সাধুর চিন্তাটাই গেঁথে রইল। তারা যখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে চা-মুড়ি খাচ্ছিল, তখনও সে একবারও চোখ খোলেনি। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের পক্ষে এতখানি সংযম সম্ভব? এর থেকে অনেক কম সংযমেও তো তার ভেক ধরার কাজ চলে যায়।

কেন ওরা খালি গায়ে চোখ বুজে বসে থাকে? কী পায়? মানুষের প্রবৃত্তি হলো পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবীর সব পুরুষই চায় এক টুকরো জমি। অন্তত একটি নারী, মাথার ওপর আচ্ছাদন, রুচিমতন পর্যাপ্ত ভোজ্যবস্তু। এরপর আরও অনেক কিছু আছে। জৈব প্রবৃত্তিই তাকে শিখিয়ে দেয় সন্তান উৎপাদন করতে. প্রকৃতি সেই সন্তানদের গায়ে মায়া মাখিয়ে দেয়।

বড় বড় দার্শনিক ও শিল্পীরা হয়তো এইসব ভোগ ও মায়ার উর্ধ্বে উঠতে পারেন, তাঁদের মনোজগতের পরিশীলন. তাঁদের অহংকার তাঁদের নিজস্ব বাসনার পথে চালায়। কিন্তু হাজার হাজার সাধু, অধিকাংশই অকাট অশিক্ষিত, তারা সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে ছাই মেখে ঘুরে বেড়ায় কিসের টানে? পাগলামি? নিষ্কর্ম বাইণ্ডুলেপনার লোভ? কিংবা কবে কে একজন পারলৌকিক মুক্তির গুজব ছড়িয়ে গেছে, এরা সবাই ভেড়ার পালের মতন সেইদিকে ছুটছে?

এরা কী করে এবং কেন এত শারীরিক কষ্ট সহ্য করে, সেটাই প্রবীরের কাছে ধাঁধার মতন লাগে। আশ্রম বানিয়ে যে-সব সাধু মহারাজরা প্রচুর চেলা চামুণ্ডা সংগ্রহ করে, বড়লোকের বউদের দিয়ে পা টেপায়, তাদের কথা সে বোঝে। কিন্তু এই যে লোকগুলো, এরা ধর্মেরই বা কী জানে? এরা পার্থিব সুখ অস্বীকার করার মতন মনের জোর পায় কোথা থেকে?

মুর্গির ঝোল, খাঁটি ঘিয়ের পরোটা আর আলু-ফুলকপির তরকারি দিয়ে ডিনার সারা হলো। স্বদেশের এরই মধ্যে নেশায় ও ঘুমে চোখ টেনে আসছে। নিখিল প্রচুর টেনেও আবার খুলেছে দ্বিতীয় বোতল। তার সঙ্গে আরও দু'একজন আছে।

সুখেন বললো, সাধুবাবার সামনে কয়েকটা চাপাটি আর তরকারি রেখে এসেছি। সাড়াশব্দ করলো না অবশ্য।

প্রবীর চমকে উঠলো।

স্বদেশ বললেন, লোকটা এখনো সেই এক জায়গায় বসে আছে? আই মাস্ট অ্যাডমিট, কল্জের জোর আছে।

সুখেন বললো, একে বলে স্যার সমুদ্রকল্প যোগ। চব্বিশ ঘণ্টা টানা ধ্যান করতে হয়। একদিন অন্তর একদিন। প্রতিবছরই এইজন্য কয়েকজন আগে থেকে আসে।

স্বদেশ জোরালো গলায় বললেন, করুক, যার যা খুশী করুক। ঠিক বারোটায় লাইট্স অফ। নিখিল শেষ করো। অন্য ঘরে আলো জ্বললেও আমার ঘুম আসে না।

বৃষ্টির সেই বেগ কমে গেলেও একেবারে থামেনি। টিপটিপ করে পড়ছে এখনো। জানলার বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। যেন এই বাংলোটাকে হঠাৎ ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে প্রবীর শুয়ে পড়লো স্বদেশের পাশের খাটে। নিখিলরা অন্য ঘরে টর্চ জ্বেলে মদ্যপান চালিয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের ফিসফিস কথা ও হাসির শব্দ। এক সময় তাও থেমে গেল। স্বদেশ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকছেন।

প্রবীরের ঘুম আসছে না। সাধুটা বৃষ্টির মধ্যেও বসেছিল? উন্মাদ ছাড়া একে আর কী বলা যায়? এ যেন তার প্রতিই ব্যক্তিগত অপমান। সে তো অনেক কিছুই চায়। সাচ্ছন্দ্য চায়, ভালোবাসা চায়, ভালো একটা বাড়িতে থাকতে চায়, রতি-সুখ চায়, ইচ্ছে মতন টাকা খরচ করতে পারলে আনন্দ হয়। আর ঐ লোকটা এসব কিছুই না চেয়ে বালির ওপর চোখ বুজে বসে থাকবে কেন?

মৃত্যুর পর আর কিছু নেই, যদি বা থাকেও তার সামান্যতম আভাসও পৃথিবীর মানুষ আজ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে জানতে পারেনি। তবু বেঁচে থাকার মূল্যবোধকে তুচ্ছ করে মৃত্যুর পরের পরমার্থের জন্য এমন হ্যাংলামি করে কেন মানুষ ?

চার পেগ হুইস্কি খেয়ে প্রবীরের মাথা গরম হয়ে গেছে, সে বিছানায় ছটফট করছে।

এক সময় সে উঠে পড়লো। জগ থেকে ঢক ঢক করে জল খেল খানিকটা। তারপর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে, টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

মাথাটা একটু টলটল করছে প্রবীরের। স্কচ খাওয়া অভ্যেস নেই, প্রবীরের পক্ষে একটু বেশিই হয়ে গেছে। সে জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলো।

টর্চের আলো বুলিয়ে বুলিয়ে জায়গাটা খুঁজে পেয়ে গেল প্রবীর। সাধুটি সেখানেই রয়েছে, ঘুমোয়নি বা শুয়ে পড়েনি। একটা শাল-পাতার ঠোঙায় পাশে পড়ে আছে রুটি ও তরকারি, সে ছোঁয়নি বোঝা যায়।

আকাশ মেঘলা হলেও একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, আবছা-ভাবে চারপাশটা দেখা যায়। হয়তো সমুদ্রের একটা নিজস্ব আভা আছে।

সরকারি লঞ্চটি ফিরে গেছে নামখানায়, দিগন্তে ছবির মতন জাহাজটিও এখন অদৃশ্য। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের জীবন্ত শব্দ।

এখানে ওকে কেউ দেখছে না, তবু কেন এই কৃচ্ছ্রসাধনা ? নাকি ওর ধারণা, আকাশ থেকে কেউ উঁকি মেরে দেখে ?

ধ্যান করার জন্য কি চোখ বুজে থাকার কোনো দরকার আছে ? চোখ মেলে সাধারণত দেখা যায় একটাই দৃশ্য, চোখ বুজে থাকলে দেখা যায় অনেক কিছু। যা খুশী ! কিংবা এরা চোখ বুজে থাকতে থাকতে শুধু একটা কিছুরই চিন্তা করে, সেটাই দেখা অভ্যেস করেছে ? কী সেটা, কোনো মূর্তি ? পাথর কিংবা পেতলের একটা পুতুল ?

বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেও বসে আছে এই মানুষটি, তাতে তার মুখে একটা গরিমা ফুটে উঠেছে ঠিকই, মাথার জটা ভেজা, সারা গা চকচক করছে। কিন্তু সে একেবারে নিঃসাড় নয়, প্রবীরের উপস্থিতিও টের পেয়েছে মনে হয়।

প্রবীর টর্চ নিবিয়ে দিল, সাধুটিকে ডাকলো না। একটু দূরত্ব রেখে সে-ও বসে পড়লো ভিজে বালির ওপর। তারপর সে একটা সিগারেট ধরালো।

সে এখানে কেন এসেছে তা সে নিজেই জানে না। সাধুটাকে কোনো আঘাত দেবার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্র নেই। সে কোনো প্রশ্নও করতে চায় না। যে-কোনো প্রশ্নেরই তো এ ধরাবাঁধা মুখস্থ বুলি শোনাবে। কিংবা এর যদি নিজস্ব কোনো উপলব্ধি থাকে, তা প্রকাশ করার ভাষা কি এর আয়ত্তে থাকতে পারে? মামুলি কথা শুনে লাভ কী?

একটা প্রবল কৌতূহল হয়েছিল, লোকটি এখনও বসে আছে কিনা দেখার জন্য। লোকটি না থাকলেই যেন প্রবীর খুশী হতো। এখন তারও চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।

একজন চোখ বোজা মানুষের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না। প্রবীর চোখ বুজলো।

প্রথমে অন্ধকার! কালোর সঙ্গে একটু নীল মেশানো। একটু একটু কাঁপছে। তারপরেই সে দেখতে পেল কৃষ্ণের মুখ। বালক কৃষ্ণ। ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি, মাথায় ময়ূরের পালক, একেবারে জীবন্ত। সেই সঙ্গে সে যেন একটা গানও শুনতে পেল, 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতে…'

প্রবীরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সাধু সংসর্গে এসেই তার কৃষ্ণ-দর্শন হয়ে গেল! কী দারুন ব্যাপার! ভগবানকে পাওয়া এত সহজ!

এটা আসলে কিছুদিন আগে দেখা 'মীরা' সিনেমার একটা টুকরো দৃশ্য। একটু পরেই বাংলা গানটা বদলে গিয়ে হলো, ম্যায়নে চাকর রাখো জী, পাশ থেকে উঁকি মারলো হেমা মালিনী!

তারপরেই সে দেখতে পেল, শত শত স্ত্রী-লোক উন্মুক্ত স্থানে বড় বাথরুম করতে বসে গেছে, একটু দূরে নাক কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন স্বদেশদা। তারপর স্বদেশদা নিজের হাতে ল্যাট্রিনের ছাউনি বসাবার জন্য বাঁশ পুতছেন। ঠিক যেন স্বপ্নের মতন পরিবর্তিত হচ্ছে দৃশ্য, শর্মিলা তরতর করে নেমে যাচ্ছে মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে। তার স্তনদুটি দোলে, পিঠের ওপর ভিজে চুল···যখন একলা অন্যমনস্ক থাকে, তখন শর্মিলাকে বেশি সুন্দর দেখায়···। বাবা বাজার করে ফিরলেন, কাঁধ দুটো ঝুলে গেছে, চোখের নীচে কালো দাগ···

এক সময় প্রবীরের চোখে জল এসে গেল। নিজেই সে বুঝতে পারলো না, তার হঠাৎ কান্না পাচ্ছে কেন? কেনই বা এখানে সে ঠাণ্ডার মধ্যে বসে আছে? নেশার ঝোঁক, তা ছাড়া আর কী! এই সাধুটিও সেরকম কোনো নেশাতেই মেতে আছে? গাঁজার চেয়েও উঁচুদরের কিছু? আত্ম-নির্যাতনের নেশা? এক ধরনের মেসোবিজ্‌ম।

প্রবীরের এক একবার মনে হচ্ছে, সে যদি এর মতন হতে পারতো! পরমার্থের প্রত্যাশী হয়ে নয়। এইরকম সমুদ্রের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার মতন বৈরাগ্য তাকে আকর্ষণ করছে। কিছুই না চাওয়া। চাকরিতে উন্নতি নয়, প্রেমের জন্য কাঙালপনা নয়, সংসারের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি···। আসলে কি প্রবীর সত্যিই এরকম হতে চায়? না, এক ধরনের ইচ্ছের বিলাসিতা। কোনো সুন্দর বাচ্চাছেলেকে খেলা করতে দেখলে হঠাৎ যেমন মনে হয়, আহা যদি ঐ বয়েসটায় ফিরে যেতে পারতুম! আসলে কেউই শৈশবে ফিরে যেতে চায় না। পরিণত বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে শৈশবে ফিরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসবে!

এই ধরনের সাধুরা, কিংবা প্রতিদিন দেখা অজস্র সংসারী মানুষও তো প্রায় শৈশবের স্তরেই রয়ে গেছে। সভ্যতার অনেক নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সন্তুষ্ট। মূর্তিহীন যে শিল্প, কাহিনী বা বক্তব্যহীন

যে কাব্য, কথাহীন যে সঙ্গীত, তার মর্ম, তার যে নিগূঢ় উপভোগ, তা এরা জানলোই না। একটি নারীকে পাওয়া কিংবা না-পাওয়া নয়, অতি সামান্যক্ষণের জন্য চোখে চোখ রাখলে যে মাধুর্যের তরঙ্গ, তার মূল্য কি কম! জীবনে পরম পাওয়ার চেয়ে তাৎক্ষণিক ছোট ছোট পাওয়ার যে মূল্য অনেক বেশি, মানুষের সভ্যতাই তা শিখিয়েছে, তবু বহু মানুষ এখনো তা জানলো না।

সিনেমার কৃষ্ণ নয়, চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে যদি কোনো ভেল্‌কির দৃশ্য দেখা যায়, তাতেই বা কী আসে যায়? এই শরীর, এই আয়ুকে অস্বীকার করে মানুষ আর বেশি কী পেতে পারে?

চোখ খোলার কি কোনো শব্দ আছে? প্রবীর যেন সেই রকমই একটা শব্দ পেল। সে নিজে চোখ মেলে দেখলো, সাধুটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার একটু শিহরণ হলো প্রবীরের। যদি সত্যিই নর্থ বিহারের খুনী হয়?

তারপরই সে ভয়টা কাটিয়ে উঠলো। সাধুটির দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিস্মিত কৌতূহল।

প্রবীর কোনো কথা বললো না, তার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। এই সাধুটি যদি কিছু জানতে চায় তো প্রশ্ন করুক।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘ সরেছে, মাথার ওপর এক ঝলক শীতের আকাশ, চাপা অন্তরীক্ষের আলো। সমুদ্র বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ওরা তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।

কোনো কথা নেই, কথার কোনো প্রয়োজনও নেই বোধহয়।

প্রবীর বুঝতে পারলো, অনেক ব্যর্থতা, ভুল ঠেলে ঠেলে জীবনটাকে নির্মাণ করে যেতে হবে। সেই এগিয়ে যাওয়াটাই একটা রোমাঞ্চকর অভিযান। যার সেই অভিযান সম্পর্কে আগ্রহ নেই, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করুক। সে ওতেও আনন্দ পাচ্ছে। তবে সেও নির্লোভ, সর্বত্যাগী নয়, সেও কিছু চাইছে। সেও পারলৌকিক

অলীকের কোনো চরম পাওয়ার জন্য আত্মনিগ্রহ করে যাচ্ছে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই. গ্রামীণ সভ্যতার আমল থেকেই চলে আসছে এমন।

সাধুটির ওষ্ঠে কোনো কাঠিন্য নেই. তাই প্রবীরও মুখখানা হাসি হাসি করে রেখেছে। প্রবীরের গায়ে একটা শাল জড়ানো. এই লোকটি খালি গায়ে, এরা দু'জনে যেন দুই ভূখণ্ডের প্রতিনিধি।

এই লোকটির মতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে ধ্যান করার প্রবৃত্তি নেই প্রবীরের। কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে থাকতে সে অনায়াসেই পারে অনেকক্ষণ। পকেট থেকে সে সিগারেট দেশলাই বার করলে. কিন্তু সাধুটির দিক থেকে চোখ সরালো না। ভাখো. তুমি আমাকে ভাখো. আমিও তোমায় দেখছি। তোমার যদি বিশ্বাসের প্রবল শক্তি থাকে, আমার অবিশ্বাসের জোরও কম নয়। তুমি এই জীবনটা বাউণ্ডুলের মতন ঘুরে ঘুরে চাইছো পরবর্তী জীবনের অমূল্য আশ্রয়। আমি বিবর্তনের চক্রে পাক খেতে খেতে এখানে এসে পৌঁছেছি. আমি জানি, মানুষের কোনো আশ্রয় নেই, সে নিজেই ক্রমশই অতি মানব থেকে অতি মানবতর হতে থাকবে, যদি না তার আগে সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে।

ওরা দু'জনে চেয়ে আছে, শুধু চেয়ে আছে।

কতক্ষণ পর, এক ঘণ্টা. দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা সাধুটিই আগে উঠলো। সোজা এগিয়ে গেল জলের দিকে। প্রবীর জলের তোলপাড় শব্দ শুনতে পেল, সাধুটি স্নান করছে! এই মধ্য ডিসেম্বরের শেষ রাতে। হয়তো ভালোই লাগে। কারুর লেপের তলায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগে। কারুর ঠাণ্ডা জলে।

সাধুটি আবার নিজের জায়গায় ফিরে বসলো। এখন সে গুণগুণ করে গানের মতন একটা শব্দ করছে। খুব শীত লাগলে সম্পূর্ণ বেসুরে মানুষের গলা থেকেও এরকম আওয়াজ বেরোয়। প্রবীর লক্ষ করলো, সাধুটি রীতিমতন কাঁপছে এখন।

সে শালপাতার ঠোঙা খুলে খাবার খেতে শুরু করলো। তার

খাওয়ার ভঙ্গিটি শিশুর মতন। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে সে দেখছে প্রবীরকে। এখন তার চোখের ভাষা বোঝা অনেক সহজ।

প্রবীর উঠে গিয়ে তার শালটা খুলে সাধুটির গায়ে জড়িয়ে দিল। সে আপত্তি করলো না। দ্রুত খাবারগুলো শেষ করে লাজুক গলায় বললো, একটা সিগ্রেট!

প্রবীর সিগারেট দিয়ে খুব বন্ধুর মতন ভঙ্গিতে দেশলাই জ্বেলে নিয়ে গেল তার মুখের কাছে।

আসলে তো ওরা অনেকদিনের চেনা!

দুই বন্ধু

ন'মাসে ছ'মাসে সত্যচরণ একবার করে আসেন বন্ধু সদাশিবের সঙ্গে দেখা করতে।

দু'জনেরই বয়েস এখন আশি ছুঁই-ছুঁই। সদাশিবের তুলনায় সত্যচরণ এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছেন, দিব্যি একাই হেঁটে চলে আসেন নারকেলডাঙা থেকে ভবানীপুর। ভিড়ের ট্রামে বাসে চড়তে-নামতেই বরং তাঁর অসুবিধে হয়। হাঁটার অভ্যেসটা তাঁর বরাবরের।

সদাশিব নিজস্ব গাড়ি চালিয়েছেন যৌবন বয়েস থেকেই। এক সময় তাঁর স্টুডিবেকার গাড়ি ছিল। হাঁটা দূরের কথা, তিনি ট্রাম-বাসেও চেপেছেন জীবনে খুবই কম। হয়তো সেই কারণেই তাঁর দুটো হাঁটুই গেছে, এখন সিঁড়ি দিয়ে একটুখানি উঠতেই প্রবল কষ্ট হয়। সেইজন্য তিনি তিনতলাতেই বসে থাকেন প্রায় সর্বক্ষণ।

সত্যচরণের রোগা, লম্বা চেহারা। হাতে সব সময় একটা ছাতা থাকে, সেই ছাতাটাই তাঁর লাঠির কাজ করে। তিনি অবশ্য ধুতির বদলে প্যান্ট-শার্ট পছন্দ করেন, বরাবর একটা বিদেশী কোম্পানিতে চাকরি করেছেন বলেই। এখন অবশ্য তাঁর বড় ছেলেরই প্রায় রিটায়ার করার বয়স হয়ে গেল!

সন্ধের সময় তিনি ভবানীপুরে এসে বন্ধুর বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন, সদাশিব! সদাশিব!

এ বাড়ির গেটে কলিং বেল আছে, কিন্তু সে কথা মনে থাকে না সত্যচরণের। বরাবর এই রকম চেঁচিয়ে ডাকাই অভ্যেস।

সদাশিবের বাড়িটা বেশ বড়। নাতি-নাতনী, ভাগ্নে-ভাগ্নী নিয়ে প্রায় কুড়ি-বাইশজনের সংসার। প্রেসের ব্যবসা করে সদাশিব প্রচুর সম্পত্তি করেছেন। সে ব্যবসা এখনো ভালোই চলছে। দুই ছেলে

সেই ব্যবসা দেখে, কিন্তু এই বয়সেও সদাশিব সব কিছুর কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন নি। নিজে আর প্রেসে যেতে পারেন না, তবু ঘরে বসেই টেলিফোনে সব খবরাখবর নেন, নির্দেশ পাঠান। এখনও পাঁচ হাজার টাকার বেশি অঙ্কের সই করার অধিকার শুধু তাঁর একার।

সত্যচরণকে এ বাড়ির সবাই চেনে, সবাই খাতির করে। তিনি এ বাড়ির কর্তাবাবুর বন্ধু। একমাত্র প্রাণের বন্ধু বলা যেতে পারে। সদাশিবের সঙ্গে সত্যচরণের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই, ব্যবসার সম্পর্ক নেই। কোনোদিন তিনি সদাশিবের প্রেস থেকে বিনা পয়সায় নিজের নামের একটা প্যাডও ছাপান নি। বরং যেদিনই তিনি এ বাড়িতে আসেন, কুড়ি-পঁচিশ টাকার একটা মিষ্টির হাঁড়ি আনেন বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্য।

সন্ধের পর সদাশিব বেশ কিছুক্ষণ পূজো-আচ্চায় কাটান। তিন-তলাতেই ঠাকুরের ঘর। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করেন সদাশিব। এক এক সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তাঁদের পরিবার আগে ছিল শাক্ত, কিন্তু সদাশিব বৈষ্ণব হয়েছেন অনেকটা। তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর শোবার ঘরে মস্ত বড় একটা কৃষ্ণের ছবি।

এই বয়েসেও অচশ্য সত্যচরণের ধর্মে মতি হয় নি! তাঁর পুজো-আচ্চার বালাই নেই। বাড়ি থেকে না বেরুলে তিনি সন্ধের সময় থেকে একমনে টি ভি দেখেন, একেবারে শেষ পর্যন্ত!

দুই বন্ধুর স্বভাবে কিংবা জীবনযাত্রায় প্রায় কোনো মিলই নেই। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। তবু, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দু'জনের বন্ধুত্ব টিকে আছে, কখনো বড় রকমের মনোমালিন্য হয় নি। বেশ কিছুদিন পরস্পরকে না দেখলে দু'জনেই ছটফট করেন।

তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেও সত্যচরণ ডাকেন, সদাশিব! সদাশিব!

বন্ধুর ডাক শুনলেই সদাশিব পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। পুজো শেষ হোক বা না হোক। খুশীতে ঝলমল করে তাঁর মুখ।

তিনি হাত বাড়িয়ে বলে ওঠেন, এসো, সতু, এসো! এবার অনেকদিন পর এলে!

তারপর তিনি বন্ধুকে নিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন!

দুই বৃদ্ধের এমন কি গোপন কথা থাকতে পারে, যা দরজা বন্ধ করে বলতে হবে? সদাশিবের ছেলেমেয়েদের ধারণা, ওঁরা দু'জনে ঐ সময় মদ খান!

তা এই বয়েসে এত ঢাক ঢাক গুড়গুড়েরই বা দরকার কী? সদাশিব এ বাড়ির বড় কর্তা, তিনি মদ খেলেই বা কে আপত্তি করবে? তাঁর স্ত্রীও বেঁচে নেই। দুই ছেলেই নিয়মিত মদ্যপান করে। আজকাল বড় বড় কোম্পানির অর্ডার আদায় করতে গেলে পার্টি দিতে হয়। আর পার্টিতে কি মদ ছাড়া চলে?

সদাশিবের ঘরের দেয়াল-আলমারিতে সত্যিই থাকে রকমারি মদের বোতল। কিন্তু তিনি মাসের পর মাস মদ ছুঁয়েও দেখেন না। একমাত্র সত্যচরণ এলেই দুটি গেলাস নিয়ে বসেন। সে সময়ে তাঁর ঘরে অন্য কারুর ঢোকা নিষেধ।

সত্যচরণ জীবনে কখনো দু' পেগের বেশি মদ্যপান করেন নি এক বৈঠকে। নেশা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আবার তো হেঁটেই ফেরেন নারকেলডাঙায়। কোনোদিন তাঁকে কেউ বেচাল হতে দেখে নি।

এতদূর থেকে আসেন তিনি, সদাশিবও তাঁকে দেখলে যথার্থ খুশী হন, তবু দুই বন্ধুর গল্প করার ধরনটা অদ্ভুত!

প্রথমে পারিবারিক কুশল প্রশ্ন, তারপর দু'জনের শারীরিক খবরাখবর তো বিনিময় হবেই। তাও বেশ সংক্ষেপে ও মৃদু গলায়। তারপর দু'জনেই চুপ।

এই বয়েসে বোধ হয় সামনাসামনি বসলেই অনেক কিছু বোঝা-বুঝি হয়ে যায়, মুখে আর কিছু বলার দরকার হয় না।

অনেকক্ষণ পর, দ্বিতীয় পেগ প্রায় অর্ধেক শেষ করার পর সদাশিব হঠাৎ বলে ওঠেন, তা হলে ওটা কুকুরই ছিল, কী বলো, সতু?

সত্যচরণ মাথা দোলাতে দোলাতে উত্তর দিলেন, না হে, অত ছোট প্রাণী তো নয়! কুকুর হবে কী করে?

সদাশিব আরও জোর দিয়ে বলেন, অনেক বড় সাইজের কুকুরও হয়। মনে করো, ওটা অ্যালসেশিয়ান!

সত্যচরণ বলেন, ঐ ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে কে অ্যালসেশিয়ান পুষবে? অত রাতে লোকের পোষা দামী কুকুর রাস্তায় ছাড়া থাকবেই বা কেন?

সদাশিব ব্যগ্রভাবে বললেন, তবে কি গাধা? হ্যাঁ, গাধাই হবে নিশ্চয়। ওদিকে ধোপাটোপারা থাকে!

সত্যচরণ আর কিছু না বলে মুচকি মুচকি হাসেন। এবার তাঁর ওঠবার সময় হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে দুই বন্ধুর প্রায় এই একই ধরনের আড্ডা চলে আসছে। শেষের দিকে উত্তেজিত ভাবে সদাশিব বন্ধুর হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন, আমি বলছি, ওটা গরু ছিল না। গাধা কিংবা কুকুর? এমন কি ছাগলও হতে পারে···

সত্যচরণ আর কোনো কথা বলেন না।

সদাশিব ব্যাকুল ভাবে বলেন, বিশ্বাস করো, সতু, আমি গো হত্যা করি নি! আমি নিজের চোখে দেখেছি···

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার এক ঘটনা। তখন সদাশিবের একটা বাগানবাড়ি ছিল মধ্যমগ্রামে। সেই বাড়িটা এখনও তাঁর আছে, তবে বাগান আর নেই, ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে শনিবার সন্ধেতে সদাশিব বন্ধুবান্ধব নিয়ে সেই বাগানবাড়িতে যেতেন ফুর্তি করতে। মেয়েঘটিত দোষ তাঁর ছিল না, গানবাজনার খুব শখ ছিল। ঐখানে মদ্যপানের সঙ্গে গান-বাজনারই চর্চা হতো।

একবার বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তা প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে। সত্যচরণকে পাশে বসিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন সদাশিব। ঈষৎ নেশা হলেও তাঁর হাতে স্টিয়ারিং ঠিক ছিল। কথা বলছিলেন একটু বেশি, সিগারেট টানছিলেন ঘন ঘন।

গঙ্গানগরের মোড়টার কাছে গাড়ি ঘোরাতে যাবেন, এমন সময় আচম্বিতে সাদা সাদা মতন কী যেন একটা দৌড়ে এলো রাস্তার মাঝখানে। সদাশিব ব্রেক কষতে একটু দেরি করে ফেললেন. অত ভারি গাড়িতে মড়মড় করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হলো।

সদাশিব হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে বলেছিলেন. কী হলো. সতু. কী হলো. কী চাপা দিলাম ?

একটু দূরেই মাঠের মধ্যে যাত্রাপালা হচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মণ্ডপটা. নাকিনাকি গলায় পুরুষেরা ফিমেল পার্ট করছে. তখনও যাত্রায় আসল মেয়েদের নেওয়াটা চল হয় নি। কয়েক হাজার লোক মুগ্ধ হয়ে শুনছে সেই যাত্রা. তারা ব্রেক কষার কর্কশ শব্দটা শুনতে পেয়েছে।

এই বুঝি তেড়ে তেড়ে আসবে দলে দলে মানুষ !

সামান্য একটা ছাগল চাপা দিলেও এখন লোকে একশো দুশো টাকা দাবি করে। পাড়ার কুকুর মরলেও তাদের শোক উথলে উঠে।

সত্যচরণ বন্ধুকে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলেছিলেন, থেমে রইলি কেন ? লোকের হাতে মার খেয়ে মরবি যে ! শিগগির স্টার্ট দে !

সদাশিব তবু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলেছিলেন, কী চাপা দিলাম ?

সত্যচরণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওটা একটা গরু ! শিগগির চল !

যাত্রার শ্রোতারা রাস্তায় এসে পৌঁছবার আগেই সদাশিব গাড়ি স্টার্ট দিলেন আবার, হুশ করে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজন লোক ইট ছুঁড়ে মেরেছিল, তাও গাড়িতে লাগে নি।

বিপদ হলো না আর কিছু। কেউ কিছু জানতেও পারলো না।

তারপর থেকেই সদাশিব নিজে গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়িতে এখন দু'জন ড্রাইভার। মধ্যমগ্রামের সেই বাড়িতেও আর কখনো ফূর্তি করতে যাওয়া হয় নি।

সদাশিব বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি একটা গরুকে চাপা দিয়েছিলেন। এমন কিছু নয়।

বছর কয়েক পরে তাঁর মনে খট্‌কা লাগলো। গো-হত্যা তো মহাপাপ। তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কিন্তু সত্যই কি সেটা গরু ছিল? সত্যচরণের মুখের কথা ছাড়া আর কী প্রমাণ আছে? গরু চাপা দিলেও পাবলিক রেগে যায়, গাড়িকে তাড়া করে। সেই-জন্যই কি সত্যচরণ বলেছিলেন গরুর কথা? কিন্তু একটা ধোপার গাধাকে যদি চাপা দেওয়া হয়, সে রাগ করে তেড়ে আসবে না? কিংবা যদি কারো বাড়ির পোষা কুকুর হয়? অনেক সময় পাড়ার একটা নেড়ি কুত্তাও কিছু মানুষের বড় ন্যাওটা হয়ে যায়, সেই কুকুরটা অপঘাতে মরলেও তারা দুঃখ পায়!

সেই দুর্ঘটনার কথা সদাশিব এ পর্যন্ত আর কারুকে ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। শুধু সত্যচরণ ছাড়া আর কেউ জানে না। সত্যচরণও নিজে থেকে কখনো তোলেন না সেই প্রসঙ্গ।

গরু চাপা দেবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলে তো স্বীকার করা হয়েই গেল যে তিনি গো-হত্যা করেছেন। সারাজীবন সেজন্য কি একটা অনুশোচনা থেকে যাবে না? কিন্তু কুকুর কিংবা গাধা হলে প্রায়শ্চিত্তও করার প্রশ্ন নেই, অনুশোচনাও হবে না। একমাত্র সত্যচরণই পারে সেটা ঠিক করে দিতে।

কিন্তু সত্যচরণ সেই যে একবার গরু বলেছে, আর কিছুতেই ফেরাবে না সে কথা!

সত্যচরণের ছেলের বিয়ের সময় সদাশিব তার বরানগরের একটা ছোট বাড়ি তাঁকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। সত্যচরণ হেসে বলেছিলেন, পাগল নাকি! তোর বাড়ি নিতে যাবো কেন, সদু? ছেলের যদি যোগ্যতা থাকে, সে নিজেই একদিন বাড়ি করবে!

সত্যচরণ চাকুরিজীবী ছিলেন, চিরকাল ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে গেলেন। তাঁর ছেলেও আজও বাড়ি করতে পারে নি।

সত্যচরণের ছোট মেয়ের সঙ্গে সদাশিবের নিজের মেজো ছেলের বিয়ে দেবার জন্য খুব উঠেপড়ে লেগেছিলেন। দুই পরিবারে জাতেরও অমিল নেই, থাকলেও সদাশিব বোধহয় গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুর

চেয়ে বড় জাত আর হতে পারে নাকি ? সে বিয়ের ব্যাপারে সত্যচরণ উৎসাহও দেখান নি, আপত্তিও করেন নি। পরে জানা গেল, সেই মেয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধুকে পছন্দ করে বসে আছে। সত্যচরণ মেয়েকে শাসন করে, সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে, বন্ধুর ঘরে কন্যা দেয়ার জন্য কোন উদ্যোগ নিলেন না, মেয়ে সেই সহপাঠীকে বিয়ে করেই দিল্লি চলে গেল।

সত্যচরণের মতিগতি বোঝা বড় শক্ত।

মাঝে মাঝে সদাশিবের সন্দেহ হয়, তিনি গোহত্যাকারী এই ভেবেই কি সত্যচরণ তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলো না এ বাড়িতে ? তাঁর বন্ধু কি তাঁকে মনে মনে ঘৃণা করে ? কিন্তু সত্যচরণ নিজে থেকেই তো আসেন এই বাড়িতে বন্ধুর খোঁজ নিতে।

এক শীতকালের সন্ধেবেলা সত্যচরণ আবার নারকেলডাঙা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলেন ভবানীপুরে। এসে দেখলেন, সদাশিবের বাড়িতে যেন কিসের হুলুস্থুল। বাড়ির সামনে ছু'খানা অন্য লোকের গাড়ি। কিছু লোক ব্যস্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে আসছে যাচ্ছে। বৈঠক-খানায় বসে আছে এক দঙ্গল লোক।

সত্যচরণ রাস্তা থেকে বন্ধুর নাম ধরে ডাকবার আগেই সদাশিবের মেজো ছেলে আদিত্য হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললো, এই যে সত্যকাকা, আপনি এসে গেছেন ? আপনার বাড়িতে টেলিফোন করেও লাইন পাই নি, একজন লোক পাঠাচ্ছিলুম।

সত্যচরণ বিপদের গন্ধ পেলেন। তবে কি এরই মধ্যে সব শেষ ?

আদিত্য বললো, আজ বেলা এগারোটায় বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কলকাতার সবচেয়ে বড় ছু'জন স্পেসালিস্টকে ডেকে এনেছি, কিন্তু কী মুশকিল বলুন তো, একজন বলছেন, এই অবস্থায় রিমুভ করাটা খুব রিস্কি। আর একজন বলছেন, নার্সিং হোমে নিয়ে না গেলে ঠিক চিকিৎসা হবে না। এখন কী করি বলুন তো ! এদিকে বাড়ির সবাই আর আত্মীয়স্বজনরাও ছু'রকম বলছেন। বড়দা

এখানে নেই, সব দায়িত্ব আমার। এখন যাচ্ছি, একজন থার্ড ডাক্তারের ওপিনিয়ান নিতে।

সত্যচরণ জোর করে নিজের মতামত জাহির করেন না। তা ছাড়া এইসব ব্যাপারে ডাক্তাররাই ভালো বুঝবে। তিনি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবার সঙ্গে কি দেখা করা যাবে? দেখা করা ঠিক হবে?

আদিত্য বললো, এখন ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি চলে যাবেন না। বুকে ব্যথার সময় বাবা বার বার আপনার কথা বলছিলেন। আপনি বরং বাবার কাছে গিয়ে একটু বসুন।

সত্যচরণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন ধীরে ধীরে। তিনি ভাবলেন, যথেষ্ট বয়স হয়েছে সদাশিবের, নার্সিংহোমে হাসপাতালে যাওয়ার আর কী দরকার, বাড়িতে আপনজনদের মুখ দেখতে দেখতে শান্তিতে চলে যাওয়াই তো ভালো!

তাঁর মনে হলো, এবার বোধহয় তাঁরও দিন ঘনিয়ে এসেছে!

গরম নেই আর তেমন, একটু বরং ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবই পড়েছে, তবু সদাশিবের শিয়রের কাছে বসে পুরোনো আমলের ঝালর দেওয়া পাখা দিয়ে বাতাস করছে তাঁর এক পুত্রবধূ। অন্য এক পুত্রবধূ সদাশিবের পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এর কোনোটাই দরকার নেই, তবু এসব সেবার চিহ্ন। সদাশিব উইল করে রেখেছেন কিনা, তাই-ই বা কে জানে!

সত্যচরণ একটা চেয়ার টেনে বসলেন, সদাশিবের দুই পুত্রবধূ তাঁকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানার একটা ভঙ্গি করলো। এ বাড়িতে এখনো এসব প্রথার চল আছে। সদাশিব চলে গেলে আর থাকবে না।

চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন সদাশিব। মুখে স্পষ্ট আসন্ন মৃত্যুর রং। তবে আজকালকার কড়া ওষুধে এই অবস্থা থেকেও অনেকে বেঁচে উঠে আরও দু'চার বছর হেসে-কেঁদে কাটিয়ে যায়।

প্রায় আধঘন্টার মধ্যেই সদাশিবের জ্ঞান ফিরে এলো কিম্বা ঘুম

ভাঙলো। চোখ মেলেই সত্যচরণকে দেখে তিনি স্পষ্টত খুশী হয়ে উঠলেন। তুই পুত্রবধূকে তিনি বললেন ঘরের বাইরে যেতে। তারা কিছুটা আপত্তি জানিয়েও চলে যেতে বাধ্য হলো।

সত্যচরণকে আরও কাছে আসার ইঙ্গিত করে সদাশিব ফিসফিস করে বললেন, তোকে কেউ খবর দিয়েছে?

সত্যচরণ চেয়ারটা টেনে এনে বললেন, না, আমি আগে খবর পাইনি এমনিই চলে এলাম।

সদাশিব বললেন, আমি আজ সারাদিন তোকে মনে মনে ডেকেছি, তাই তুই আসতে বাধ্য হয়েছিস, সতু! তুই না এলে মরেও আমার শান্তি হতো না। দরজাটা বন্ধ করে দে। ঐ আলমারিতে ছাখ হুইস্কি আছে, গেলাস আছে।

বন্ধু এতখানি অসুস্থ, সেই অবস্থায় তাঁর পাশে বসে সত্যচরণ মদ্যপান করবেন, এ কী অদ্ভুত প্রস্তাব!

সত্যচরণ মাথা নেড়ে বললেন, না, আজ আর ওসবের দরকার নেই।

সদাশিব কাতরভাবে বললেন, তুই একটু খা, সতু। তাতে আমার তৃপ্তি হবে। এতকাল আমরা একসঙ্গে···আজ তুই শুধু শুধু বসে থাকবি, তা কি হয়?

সত্যচরণ দৃঢ়ভাবে বললেন, সে প্রশ্নই উঠে না। তুই ভাল হয়ে ওঠ, তারপর আবার আমরা একসঙ্গে বসে খাবো।

সদাশিব বললেন, ভালো হয়ে উঠবো? হ্যাঁ, কিন্তু যদি আর এযাত্রা না উঠি? মাথায় একটা পাপের বোঝা নিয়ে চলে যাবো? সতু, এখন অন্ততঃ সত্যি করে বল, ওটা কি গরুই ছিল, না অন্য কোনো জানোয়ার?

সত্যচরণ চুপ করে রইলেন।

সদাশিব মাথাটা একটু উঁচু করে বললেন, সতু, তুই একবার সেদিনের ঘটনাটা ভালো করে ভেবে বল্!

সত্যচরণ তবু চুপ করে রইলেন। মধ্যমগ্রাম থেকে সেই রাত্তে ফেরার ঘটনাটা তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

সদাশিব দুর্বল হাতখানি তুলে বন্ধুর গায়ে রেখে বললেন, আর কেউ না জানুক, তুই তো জানবি, আমি গো-হত্যার পাপ মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি! কিন্তু তোর তো ভুল হতেও পারে, সেদিন অন্ধকার রাত ছিল, অমাবস্যার ঠিক পরের দিন···

সত্যচরণ এক দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মৃত্যু-পথযাত্রীকে যে-কোনো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে দোষ নেই। তিনি মৃদু হেসে বললেন, তোর সঙ্গে আমি এতকাল ঠাট্টা করতুম রে। সেটা ছিল আসলে একটা গাধা! কুকুরটুকুর না, গাধা! স্পষ্ট দেখেছি! তুই গো-হত্যা করিস নি। গাধারা তো এরকম মরেই!

একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সদাশিব। দু' চোখ দিয়ে গড়িয়ে এলো জল। একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি তোশকের তলা থেকে টেনে বের করলেন একটা বড় খাম। তার মধ্যে অনেককালের পুরনো একটা মলিন খবরের কাগজের কাটিং। সেটা সদাশিব ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। তিনি যে গো-হত্যা করেন নি, তার অকাট্য প্রমাণ এতদিন তাঁর কাছে জমা ছিল।

ঐ কাগজের কাটিংটা সত্যচরণের চেনা। তাঁর কাছেও একটা আছে। ঐ কাগজে ছাপা হয়েছিল গঙ্গানগরের মোড়ে সেই নিহত যুবকটির ছবি।

পাখির মা

ছেলেটা বিশেষ কথা বলে না। বেড়ার বাইরের পেঁপে গাছটা জড়িয়ে ধরে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খোঁড়ে। একটা আট হাত ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা। খালি গা বেশ তেল চকচকে কালো। মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। সেই চুলে লাল পট্টি বাঁধা, তাতে আবার গুঁজেছে শকুনের পালক। বয়েস বাইশ তেইশের বেশি না।

উঠোনটা ঝাঁট দিতে দিতে মঙ্গলা মুখ তুলে তৃতীয়বার বললো, আজ কিছু নেই রে!

উঠোনের এক কোণে প্যাক প্যাক আর হ্যাঁস হ্যাঁস করছে তিনটে হাঁসা আর হাঁসী। তেঁতুল গাছের ঝিরঝিরে ছায়ায় বসে আছে কুকুরটা। ধানের গোলার পাশে খাটিয়া পেতে বসে পুরোনো খবরের কাগজ লম্বা করে মেলে পড়ছে জগদীশ। ভাঁজ করা লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা, তার একটা পা অস্বাভাবিক সরু, জীবনে কখনো সে সোজা হয়ে দু পায়ে হাঁটেনি।

জগদীশ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, কে এসেছে? কী চাই?

মঙ্গলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ডুরে শাড়ির আঁচলে মুখটা মুছে বললো, ও সেই লোধাদের ছেলেটা। ডুলুং।

একটা আতা গাছের আড়াল পড়েছে বলে জগদীশ ছেলেটিকে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। তার ভুরু দুটো ঘোঁচ হয়ে গেল, সে নিম্নস্বরে বললো, ওকে দিয়ে আজ কী করাবে?

মঙ্গলা উত্তর দিল, সেই তো বলছি, আজ কোনো কাজ নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছে।

এটা হাসির কথা নয়, তবু মঙ্গলা হাসলো। অত বড় একটা জোয়ান ছেলে, তবু যেন সব কথার মানে বোঝে না। পেঁপে গাছতলায় নখ দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে সে একটা গর্ত করে ফেলেছে।

জগদীশ বললো, ওকে যেতে বলে দাও! বলো, দু'তিন মাসের মধ্যে আমাদের আর লাগবে না!

কুকুরটা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল বেড়ার দিকে।

কুকুরটাকে অ্যাই চুপ মার বলে মঙ্গলা ডাকলো, কমলা একবাটি মুড়ি নিয়ে আয় তো!

জগদীশ দাঁতে দাঁত পিষে বললো, আবার ওকে মুড়ি খাওয়াবে?

মঙ্গলা তা গ্রাহ্য করলো না। জমি-জিরেত, টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে যেমন তার স্বামীর মতামতের প্রতিবাদ করে না, সেই-রকম সংসারের জিনিসপত্র, কিংবা কে কী খাবে সে ব্যাপারেও সে জগদীশের মতামতের মূল্য দেয় না।

ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরী কমলা একটা কলাই করা বাটিতে নিয়ে এলো মুড়ি। সে আগেই ডুলুংকে দেখেছে, মুড়ির সঙ্গে তিনটে পেঁয়াজ আর গোটা দশেক কাঁচা লঙ্কাও এনেছে।

বেড়ার ধারে গিয়ে বললো, এই নাও!

হাতের টাঙ্গিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ডুলুং প্রথমে দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করলো, তারপর মুড়ির পরিমাণ অনেকটা দেখে সে ধুতির কাছাটা খুলে মেলে ধরলো।

এ রকম একটা শক্ত সমর্থ পুরুষকে ভিক্ষের মতন মুড়ি দিতে কমলার খারাপ লাগে, আবার ডুলুং-কে সে একটু ভয়ও পায়। কেমন যেন খয়েরি ধরনের চোখ, তাতে রাগ রাগ ভাব।

মাড পেয়েই পুঁটুলি বেঁধে মাঠের দিকে নেমে গেল ডুলুং। উঠোনে এসে হাসিতে ফেটে পড়লো কমলা, মঙ্গলাও কোমরে হাত দিয়ে হাসতে লাগলো। জগদীশ মন দিয়ে আবার কাগজ পড়ছে।

সপ্তাহ দু'এক আগে ধান সেদ্ধ করার সময়ে অনেক কাঠের দরকার পড়েছিল। এদিকে পাট কাঠি পাওয়া যায় না। এদের বাগানেই একটা জারুল গাছে উই ধরে ফোঁপরা অবস্থায় ছিল, সেটাকে আর রেখে লাভ নেই, কিন্তু অত বড় গাছটাকে চ্যালা করবে কে?

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বলতে তো ঐ একজন, জগদীশ, তার এক পায়ে জোর নেই, সর্বক্ষণ বসে থাকে বলে ইদানীং তার কোমরেও জোর কমে গেছে।

লোধাদের এই ছেলেটা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, তাকে ডেকেছিল মঙ্গলা। তা এক বেলাতেই ছেলেটা জারুল গাছটাকে কেটে কুটি কুটি করে ফেললে। তার বদলে পাঁচটা টাকা দিতেই সে খুশী।

এদের একটা জমিতে মুড়ির ধান হয়। মঙ্গলা সেদিন মুড়ি ভাজছিল। ডুলুং অত খাটলো, তাকে কিছু মুড়ি খেতে দেওয়া হলো। সে একখানা দৃশ্য বটে!

ছেলেটার ডান-বাঁ জ্ঞান নেই, সে দু'হাতে মুড়ি খায়। প্রায় চোখের নিমেষে এক বাটি মুড়ি শেষ! আর দুটি দেবো? সে ঘাড় হেলালো।

বাঘা ঝাল কাঁচা লঙ্কা সে এমন কচ কচ করে চিবোয় যেন টিয়াপাখি, তার ঝালের কোনো বোধই নেই। আবার মুড়ি দেওয়া হলো, তাতে সে জল ঢেলে দলা পাকিয়ে খেতে লাগলো, যেন আগে কখনো সে মুড়ির মতন অমৃত খায়নি! বড় মজা হয়েছিল সেদিন।

লোধাদের ছেলেদের দিয়ে কাজ করানো পছন্দ হয়নি জগদীশের। ওদের একবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলেই সব ঘাঁত-ঘোঁত জেনে যায়। তারপর কখন এসে যে চুরি করে সব ফাঁক করে দেবে, তার ঠিক নেই। তা ছাড়া এ বাড়িতে কখনো জন খাটাবার দরকার হলে পরিচিত সাঁওতাল পরিবার থেকে ডাকা হয়, অন্য গ্রামের লোধাদের কাজ দিলে সাঁওতালরা চটে যাবে!

তা নিত্যি নিত্যি কীই-বা এমন কাজ থাকে! তবু ছেলেটা খোঁজ নিতে আসে, বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কথা বলে না, কোনো দাবি জানায় না। তাকে একবাটি মুড়ি দিলে সে খুশী হয়ে চলে যায়। কাজের খোঁজে, না মুড়ির লোভে সে আসে? মুড়ি কি আর কোথাও পাওয়া যায় না?

একদিন মঙ্গলা বাড়ি ছিল না, কনক-দুর্গার মন্দিরে মানতের পুজো

দিতে গিয়েছিল। ঐ ডুলুং বেড়া ঠেলে ঢুকে পড়েছিল উঠোনে, পেঁপে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বোধ হয় আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছিল না। জগদীশ হুংকার দিয়ে বলে উঠেছিল, অ্যাই ছোঁড়া, তুই হুট ক'রে ভেতরে ঢুকলি যে? কে তোকে হুকুম দিয়েছে? ভূতের মতন দাঁড়িয়ে রইলি যে, বাইরে যা! বাড়িতে কেউ নেই!

পাথরের মতন শক্ত শরীর, বুকখানা যেন লোহার পাত, মাথায় বাবরি চুল, হাতে ধারালো টাঙ্গি, তবু সেই ছেলে জগদীশের মতন একজন পঙ্গু মানুষের ধমক খেয়ে কুঁকড়ে যায়, পায়ে পায়ে পালায় উঠোন ছেড়ে।

যার শরীরে শক্তি নেই, তার তাগদ হলো টাকা। যার টাকার জোর থাকে, তার বন্দুকও থাকে। জগদীশের বন্দুক তো আছেই, তাছাড়াও আশপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামের মানুষ জানে, জগদীশের মতন সেরা মাথা আর কারুর নয়।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত প্রতিদিন বসে থাকে উঠোনের ঐ খাটিয়ায়। খুব বৃষ্টির সময় খাটিয়াটা টেনে আনা হয় একটা ছাউনির তলায়। ঐখানে বসে বসে জগদীশ তার বিষয় সম্পত্তি চালায়। তার জমি চাষ করে বর্গাদার, জগদীশ কখনো তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলে, কখনো ধমকায়, কখনো অযাচিতভাবে দু'পয়সা বেশি দেয়, কিন্তু কেউ তাকে এক কড়া ফাঁকি দিতে পারে না। সব দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই ভাবে সে তার দু' মেয়ের বিয়ে দিয়েও জমি বাড়িয়েছে।

তবে নিছক বিষয়ী নয় জগদীশ, সে পড়াশুনো করা মানুষ। ইস্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর এই খাটিয়ায় বসে বসেই সে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছে। যখনই সময় পায়, সে কিছু না কিছু পড়ে। পোস্টাফিসে তার নামে খবরের কাগজ আসে, পত্র-পত্রিকা আসে। পঙ্গু পা নিয়ে সে কদাচিৎ বাড়ির বাইরে যায় বটে, কিন্তু সারা দেশে কোথায় কী ঘটছে, সে সব খবর তার জানা। এমনকি বিদেশী অতিথিও আসে তার বাড়িতে।

ধানের গোলাটা নিছক শোভা ; গোমুখ্যু ছাড়া কি কেউ আজকাল উঠোনের গোলায় ধান ভরে রাখে ? এ যেন নেমন্তন্ন করে চোর ডাকাতদের ডেকে আনা। এক বস্তা খোরাকির চাল রেখে বাকি সব দাদন দিয়ে দেয় জগদীশ। কাঁচা টাকাও সে বাড়িতে রাখে না। তা হলে আর গ্রামে পোস্ট অফিস হয়েছে কেন ? তার বন্দুক আছে বটে কিন্তু কখনো বার করে না, বছরে একবার শুধু এস ডি ও অফিসে সে লাইসেন্স রিনিউ করে নিয়ে আসে। বছর সাতেক আগে জগদীশ একবার একটা পাগলা কুকুরকে এক গুলিতে খতম করে তার হাতের টিপ বুঝিয়ে দিয়েছিল। গ্রামের বহু লোক এখনো সেই গল্প করে।

ধানের গোলা একেবারে শূন্য রাখতে নেই, তাই দু'কুলো ধান সেখানে ঢালা হয় প্রতি মরসুমে। জগদীশ মঙ্গলাকে বলে, মাঝে মাঝে গোবরছড়া দিয়ে গোলাটা লেপে দিতে, তখন গোলাটা বাপ-দাদার আমলের মতন সুন্দর দেখায়। জগদীশের দেখতে ভালো লাগে।

গোলাটায় হেলান দিয়ে সে বসে। তার বাড়ির ডানপাশে নিজস্ব বাগান, তারপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে খাঁ খাঁ মাঠ, তারপর নদী। সেদিকে চোখ চলে যায়।

অনেক দূরে, একটা পাকুড় গাছের নীচে বসে আছে লোধাদের সেই জোয়ান ছেলেটা। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে। মাঝে মাঝে সে হাতের টাঙ্গিটা তুলে লাফাচ্ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মাটিতে। ঠিক যেন একটা ছায়া পুতুলের নাচ।

চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে এসে কমলা ঐদিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, ঐ ছেলেটা সারা দুপুর মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় কেন, ও কোনো কাজ করে না ?

জগদীশ বললো, ওরা কী কাজ করবে ? চাষের কাজ জানে না, কিছু জানে না। কোনো কাজেই ওদের একদিনের বেশি দু'দিন মন বসে না। মাঠে মাঠে ঘোরে কেন জানিস ? ইঁদুর খোঁজে।

ইঁদুর ?

হ্যাঁ রে, ইঁদুর। ফসল কাটা হয়ে গেছে, এখন ঝুরো ধানের লোভে মোটা মোটা ইঁদুর মাঠে এসে ছুটোপুটি করবে। ওরা ইঁদুর ধরে সেই মাংস খায়!

ইঁদুরের মাংস খায়? অ্যাঃ! থুঃ!

ইঁদুরের মাংস বোধ হয় খেতে খুব খারাপ হবে না রে! খরগোশের থেকে খারাপ হবার তো কোনো যুক্তি নাই!

ও সারা বছর ইঁদুর খায়?

নাঃ, অত ইঁদুর পাবে কোথা থেকে। তাছাড়া ইঁদুর ধরাও তো সোজা কম্ম নয়! যখন মাঠে কিছু পায় না, তখন জঙ্গলে যায়। নদীর ওধারে ঐ যে জঙ্গল। ওখানে দু' একটা খরগোশ-মরগোশ যদি পেয়ে যায়। অনেক গাছতলায় ছাতু হয়। বুনো জাম আর কুসুম ফল খায়। ওরা বিয়ের সময় কী করে জানিস?

কমলা দু'দিকে মাথা নাড়ে।

ঐ যে ছোঁড়াটা, ডুলুং, মনে কর ওর বিয়ে করার শখ হয়েছে। একটা মেয়েকে মনেও ধরেছে বেশ। তখন ও মেয়ের বাপকে জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যাবে। তড়বড় তড়বড় করে একটা বড় গাছের ডগায় উঠে গিয়ে এক হাত ছড়িয়ে হেঁকে বলবে, ঐ যে দেখছো টিলাটার মাথায় একটা শিমুল গাছ লি লি করছে, এখেন থেকে ঐ পর্যন্তক জঙ্গল হলো গে আমার! তার মানে কী বল তো?

কমলা আবার দু'দিকে মাথা নাড়ে।

জগদীশ বললো, জঙ্গলের মালিক তো আর ও নয় জঙ্গল সরকারের। বিয়ের পাত্তর জানাবে যে এতখানি জঙ্গলের ফল মূল কুড়োবার সে হক্‌দার। সেই রোজগারে সে বউকে খাওয়াবে।

কমলা একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো বাবার দিকে। তার জ্ঞানের বয়েস থেকে সে বাবাকে এই খাটিয়ার সঙ্গে সেঁটে থাকতে দেখেছে, কখনো জগদীশ ঐ ডাঙা জমি কিংবা নদীর ওপারের জঙ্গলে যায়নি। খোঁড়া পা-টা এখন প্রায় অসাড় হয়ে গেছে বলে সে আর হাঁটতেই

চায় না। কমলা একদিন শুনেছিল, তার বাবা একজনকে রাগ করে বলেছিল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে ভিখিরিরা। আমাকে কি সেই পেয়েছো!

মাঠে বা জঙ্গলে যায় না জগদীশ। তবু সে মাঠ আর জঙ্গলের সব বৃত্তান্ত জানে।

কমলা তারপর চেয়ে রইল নদীর ওপারের অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে। সে যেন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল, একজন সুঠাম যুবক একটা বিশাল শিরীষ গাছের মগডালে উঠে চিৎকার করে বলছে, এই জঙ্গল আমার!

ডুলুং-এর কি বিয়ে হয়ে গেছে? ওর মুখ দিয়ে তো কোনো কথাই বেরোয় না।

এক ঝলক শীতের হাওয়া এসে শরীরে আদর করে দিল। এখন রোদ্দুরটা কী মনোরম লাগছে। এক্কা দোক্কা খেলার মতন পা ফেলার ভঙ্গিতে কমলা ছুটে চলে গেল পুকুর ধারে।

॥ ২ ॥

প্রথমে ঘুম ভাঙলো মঙ্গলার।

যাকে গোটা সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেই মেয়ে মানুষের ঘুম কখনো গাঢ় হয় না। এই তো মাস দু'এক আগে এক চোর এসেছিল, কুকুরটা ঘেউ ঘেউয়োবার আগেই সামান্য শব্দ শুনে মঙ্গলা উঠে বসে চেঁচিয়েছিল, কে? কে?

তার সেই চিৎকার শুনে ভেগে গিয়েছিল চোরেরা। রাত-বিরেতে একা বাইরে বেরুতেও ভয় পায় না মঙ্গলা।

আজও মঙ্গলা চোখ মেলে উৎকর্ণ হলো। প্রথমে মনে হয় স্বপ্ন। ঝড় এলো নাকি? সবে মাত্র কুমড়োর ডগাগুলো ঘরের চালে তুলে দেওয়া হয়েছে, ওগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। না, না, অঘ্রাণ মাসে ঝড় আসবে কেন! তা হলে কি অনেক মানুষজন জড়ো হয়ে কথা বলছে?

কয়েক মুহূর্তেই মঙ্গলার ঘোর কেটে গেল। স্বামীর গায়ে ধাক্কা মেরে সে চেঁচিয়ে উঠলো, ওরা এসে গেছে গো, এসে গেছে!

পাশের ঘরে কমলা, তার ছোট বোন নীতি, বুড়ি পিসি, তার ছেলে নাড়ু সবাই জেগে উঠেছে। জগদীশ লম্বা টর্চটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে এলো।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে উঠোন, ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই তবু শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে মাথার ওপরে। লম্বা ডানা মেলে বিশাল আকারের এক একটা পাখি বাড়িটার ওপর দু'এক চক্কর ঘুরে তারপর ঝুপ করে এসে বসছে শিরীষ গাছে। একটার পর একটা!

কমলা ফিসফিস করে বললো, মা, আগের বছর ওরা দুপুরবেলা এসেছিল না?

মঙ্গলা মাথা নাড়লো। কোনো বছরই ওরা রাত্তিরে আসেনি। এখন রাত অন্তত তিন প্রহর হবে। কতদূর থেকে, রাত্রির আকাশ পেরিয়ে ওরা আসে, তবু এই বাড়ির বাগান চিনতে ভুল হয় না।

নাড়ু গুণতে লাগলো, তের-চোদ্দ-পনেরো···

একবার দিনের বেলা ওরা গুণেছিল, দুশো সাতটা।

গাছে বসার পর ওরা ডাকছে কঁক কঁক, কঁক কঁক, কঁক···এক একসময় মানুষের গলার আওয়াজ বলে ভুল হয়। ঠিক যেন মানুষের মতনই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে।

যেন ওরা বলতে চাইছে, আমরা আবার এসেছি গো। তোমাদের অতিথি। চিনতে পারছো?

শেষ দুটো পাখি এখনো বসেনি, ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা নীচে নেমে এসেছে, ডানা ঝটপটিয়ে যেন ওদের প্রণাম জানাচ্ছে।

কমলা বলে উঠলো, কী সুন্দর!

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না জগদীশ, সে একটা মাচিয়া পেতে পেতে বসলো, সিগারেট ধরালো। ঠাণ্ডা বাতাস চাঁদের আলোয় নির্মল, তার মধ্যে সাদা ধপধপে এক একটা পাখিকে মনে হয় যেন স্বর্গের পরী।

এক সময় মঙ্গলা বললো, এবার ভেতরে চলো, ঠাণ্ডা লেগে যাবে!

জগদীশ বললো, তোমরা শুয়ে পড়ো গে, আমি আর একটু বসি।

এখন প্রত্যেকদিনই এই পাখিগুলোকে দেখা যাবে, তবু এই চাঁদের আলোয় ওদের ওড়াউড়ির দৃশ্য জগদীশকে মুগ্ধ করে রাখে।

প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন জগদীশের এই পাখিগুলো সম্পর্কে প্রীতি অনেকের কাছে রহস্যময় মনে হয়। এদের সঙ্গে তার লাভ-লোকসানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তবে এটা বিস্ময়কর ঠিকই, এই বিদেশী পাখিরা এ গ্রামের আর কোনো বাড়িতে যায় না, আর কোনো গাছে বসে না। জগদীশের বাগানে দুটিমাত্র শিরীষ গাছ তাদের পছন্দ, সেই দুটি গাছে অতগুলো পাখি গাদাগাদি করে থাকে। এক একসময় ওরা সবাই মিলে যখন কঁক কঁক করে, তখন আর কোনো শব্দ শোনা যায় না।

এই সারস জাতের পাখিগুলো যে ঠিক কোথা থেকে আসে, তা সঠিক জানে না কেউ। কেউ বলে অষ্ট্রেলিয়া, কেউ বলে সুইডেন। এই দুটো দেশ যে পৃথিবীর একেবারে বিপরীত দিকে, সে জ্ঞান জগদীশের আছে। পাখি সম্পর্কে সে বাংলা বইও আনিয়েছে কলকাতায় অর্ডার দিয়ে। মাইগ্রেটরি বার্ডদের সম্পর্কে সে পড়েছে, কিন্তু তার বাগানের পাখিগুলো যে ঠিক কোন্ দেশ থেকে উড়ে আসে, তার হদিশ সে পায়নি।

সাঁওতালরা বলে সাহেব পাখি!

নিজের বাড়ির উঠোন ছেড়ে কোথাও যায় না জগদীশ, এই পাখি-গুলো তার কাছে বাইরের পৃথিবীর দূত।

শহরের মানুষ এদিকে বেড়াতে এলে পাখিগুলো দেখতে আসে। এক একজন এক একরকম ইংরিজি নাম বলে, বাংলায় কেউ কিছু স্পষ্ট করে বোঝাতে পারে না। খবরের কাগজের লোক এসে দু একবার ছবি তুলে নিয়ে গেছে। বাইরের লোক এ গ্রামে এসে জিজ্ঞেস করে, পাখিওয়ালা জগদীশ মণ্ডলের বাড়ি কোন্‌টা?

এ গ্রামের মানুষ কেউ ঐ পাখিদের মারে না। সাঁওতালরাও

মারে না। পাখিগুলো তাদের অতিথি। শুধু ভয় লোধাদের সম্পর্কে। এককালে ওরা ছিল যাযাবর, এখন ঘর-বাড়ি বেঁধে থাকলেও ওদের কারুর কারুর স্বভাব আজও অনেকটা বনচর ধরনের রয়ে গেছে। মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। যে-জঙ্গলে কোনো জানোয়ার নেই বলে সবাই ভাবে, সেখান থেকেও ওরা হঠাৎ একটা শুয়োর মেরে নিয়ে আসে। সাপ মারে, ইঁদুর মারে। কবুতর মেরে পুড়িয়ে খায়। এরকম বড় বড় সারস পাখি পেলে তো তারা মারবেই। এক একটা পাখির মাংস হবে অন্তত চার-পাঁচ কিলো।

লোধাদের সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক ভালো না। লোধারা সাধারণত প্রকাশ্যে নিজেদের এলাকা ছেড়ে এ গ্রামে আসেও না। তবু কয়েকজনকে ধরে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের কোনো বাড়িতে বড় রকমের চুরি হলে দু'চারটে লোধাকে ধরে ঠ্যাঙানি দেওয়া হয় এক চোট, তারা চুরি করুক, বা না করুক, সে প্রমাণের দরকার নেই। ওদের ভয় পাইয়ে রাখাটাই দরকার।

জগদীশ সারারাত বসে রইলো জ্যোৎস্নার মধ্যে।

সকালবেলায় মঙ্গলা বাগানের শিরীষ গাছদুটোর তলায় গিয়ে কুলোয় ধান-দুব্বো নিয়ে পাখিগুলোকে বরণ করলো। কমলা শাঁখ বাজালো। উলু দিল বুড়ি পিসি।

ধানগুলো দুটো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিল মঙ্গলা। যদিও এই পাখিরা ধান খায় না।

গাছদুটো একেবারে সাদা ধপধপে হয়ে গেছে। যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। পাখিগুলো ঠেলাঠেলি করছে নিজেদের মধ্যে। তবু ওরা অন্য গাছে যাবে না। এই গাছদুটোই যে ওদের কেন এত পছন্দ কে জানে! কত শত মাইল দূর থেকে তারা উড়ে আসে, এখানে নামে, একবারও ভুল করেও অন্য কোনো গাছে বসে না।

কমলা বললো, দ্যাখ নাড়ু, এবার মনে হচ্ছে তিন চারটে নতুন বাচ্চা এসেছে!

পাখিগুলোর মধ্যে ছোট বড় আছে, কিন্তু কোনগুলো যে ঠিক বাচ্চা, তা ওরা বুঝতে পারে না।

তবু নাড়ু বিজ্ঞের মতন বললো। তিন-চারটে নয়, এগারোটা বাচ্চা, আমি গুণেছি।

বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত এই পাখিগুলোকে চেনে, কোনো পাখি কখনো দৈবাৎ গাছ থেকে খসে পড়লেও সে তেড়ে যায় না, কুঁই কুঁই শব্দ করে ল্যাজ নাড়ে। এক এক সময় সে গাছ তলায় গেলেই তার গায়ে পিচিৎ পিচিৎ করে পাখিদের পুরীষ পড়ে। মঙ্গলা-নাড়ুরা হেসে ওঠে।

সব পাখিগুলো এক সঙ্গে খাবারের সন্ধানে যায় না। এক ঝাঁক যায়, এক ঝাঁক ফিরে আসে। ওরা জঙ্গলের মধ্যে যেতে চায় না, নদীর ধারটাতেই বেশির ভাগ সময় বসে। ওরা যে ঠিক কী খেয়ে বেঁচে থাকে, তাও বোঝা যায় না। শীতের শীর্ণ নদীতে কী-ই বা মাছ আছে! গেঁড়ি-গুগলিও তেমন চোখে পড়ে না। তবে ওরা লম্বা লম্বা ঠোঁট ডুবিয়ে প্রায়ই জল পান করে অনেকখানি।

সব পাখির মধ্যে সারস জাতীয় পাখিরই জলপিপাসা বেশি, এ কথা জানিয়েছে জগদীশ। হয়তো এই ছোট্ট নদীর জলটাই ওদের বেশি পছন্দ, সেইজন্যই ওরা এখানে আসে।

ওরা মানুষ দেখে ভয় পায় না। তবে মানুষদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রাখে। নদীর ধারে, জঙ্গলের দিকটায় ওরা দল বেঁধে বসে, সেদিকে কখনো মানুষ এসে পড়লে ওরা মুখ তুলে দেখে, একটুক্ষণ অপেক্ষা করে, যেন ওরা মানুষ চেনে, কোনো কোনো মানুষের চোখ দেখে কিছু বোঝে, হঠাৎ দল বেঁধে এক সঙ্গে উড়ে যায়। আবার কোনো কোনো মানুষ দেখলে একটু সরেও না।

প্রথম কয়েকদিন কমলা, নীতি, নাড়ুদের খুব উৎসাহ থাকে। অনেকক্ষণ বাগানে বসে থেকে পাখিগুলোর ডাক শোনে, কীর্তিকলাপ দেখে। নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে কোনো পাথরের আড়ালে বসে থাকে। গ্রামের অন্য ছেলেমেয়েরা এলে তাদের দিকে কমলা

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। এসব তাদের বাড়ির পাখি, তাদের নিজস্ব।

নদীর ধারের সব কাশ ফুল এখনো শুকিয়ে যায়নি। তাদের সঙ্গে যেন মিশে গেছে ঝাঁক ঝাঁক সারস। মাঝে মাঝে এক একটা লম্বা ডানা ঝাপটে চলে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে, আবার ফিরে আসছে, নদীর ওপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে নামিয়ে দিচ্ছে দুটি পা, নখগুলো ছড়ানো, একটা ছাতায় মতন আস্তে আস্তে পড়ছে নদীর জলে।

পাকুড়গাছের তলায় বড় পাথরটার আড়ালে বসে ছিল ডুলুং, কমলাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো। মাথার লাল ফেটিতে শকুনের পালকের বদলে আজ একটা সাদা পালক গোঁজা, হাতে টাঙ্গি। খয়েরি চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক।

নাড়ুর বয়েস মাত্র এগারো, বড়োদের গলার আওয়াজ নকল করে সে তড়পে বললো, অ্যাই, তুই এখানে কী করছিস?

ডুলুং কোনো উত্তর দিল না।

নাড়ু কমলার দিকে তাকিয়ে বললো, এ ব্যাটার মতলব খারাপ!

কমলা একটু লজ্জা পেয়েছে ওকে দেখে। গতকাল সকালেও এই ডুলুং এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের বেড়ার পাশে, মঙ্গলা তখন পুকুরে স্নান করতে গেছে। জগদীশ খুব জোর দাবড়ি দিয়েছে ডুলুংকে। রোজ রোজ মুড়ি ভিক্ষে করতে আসিস, তোর লজ্জা করে না? এ বাড়িতে কোনো কাজ নেই, যা ভাগ!

বাড়িতে মুড়ি ফুরিয়ে এসেছে, অন্যদের দান করার মতন বিশেষ নেই, তবু মঙ্গলা থাকলে দুটি দিত নিশ্চয়ই।

ডুলুং কমলার দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন সব দোষ তার।

এই বছরই পুরুষ মানুষের সোজাসুজি দৃষ্টি দেখলে কমলার গা শিরশির করতে শুরু করছে। সামনের বৈশাখে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। নীলমণির হাটের জগন্নাথ দাসের ছেলে গগনের সঙ্গে। ওদের একটা মুদির দোকান আছে, গোয়ালে পাঁচটা গরু আছে।

মাত্র তো দুখানা গ্রাম পরে, ঐ বাড়িতে যদি ডুলুং কখনো যায়, কমলা তাকে পেট ভরে মুড়ি খেতে দেবে।

কমলা জিজ্ঞেস করলো, অ্যাই, তোমার বিয়ে হয়েছে? তুমি একটা গাছের মাথায় চড়ে···

কমলার কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না ডুলুং, দৌড়ে নেমে গেল নদীতে; তারপর হাঁটু সমান জল ছপছপিয়ে নদী পার হয়ে নল খাগড়ার জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

সেদিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে রইলো কমলা। সেই ছোটবেলায় সে ঐ জঙ্গলে গিয়েছিল, এখন সবাই যেতে বারণ করে। ওখানে নাকি লুকিয়ে থাকে চোর-ডাকাতেরা। কারা যেন গাছ কাটে। মড় মড় করে ভেঙে পড়ে বড় বড় শাল গাছ। জঙ্গল নিকেশ হয়ে যাচ্ছে প্রায়। উঁচু উঁচু গাছগুলো সব নষ্ট হয়ে গেলে ডুলুং কোন গাছের ডগায় চড়ে বলবে, এই জঙ্গল আমার?

পাখিগুলো হঠাৎ জোরে জোরে ডাকতে শুরু করেছে। এক জায়গায় দশ বারোটা পাখি কঁক কঁক করতে করতে লাফাচ্ছে। কিসের যেন একটা চাঞ্চল্য ওখানে। নদীতে গা ভাসিয়ে যে পাখিগুলো অপ্সরার মতন স্নান করছিল, তারাও ডেকে উঠলো।

নাড় উত্তেজিত ভাবে বললো, ইঁদুর! ইঁদুর!

একটা মস্ত ধেড়ে ইঁদুর প্রাণ ভয়ে ছুটছে এদিক ওদিক, দশ বারোটা সারস তাকে ঘিরে ধরে ঠোকরাবার চেষ্টা করছে। ইঁদুরটা পালাতে পারল না, মিনিট খানেকের মধ্যেই একেবারে নিশ্চিহ্ন!

কমলার গা-টা গুলিয়ে উঠলো। এমন সুন্দর ধপধপে সারসগুলো ইঁদুর খায়? ডুলুং এখানে ইঁদুর খুঁজতে এসেছিল, প্রতি বছর এই সারসরা এসে ডুলুংদের খাদ্যে ভাগ বসায়।

পরক্ষণেই কমলা আবার ভাবলো, ও মা, এ আবার কী কথা! ইঁদুর বুঝি মানুষের খাদ্য! সাপ কিংবা পাখিদেরই তো ইঁদুর মারার কথা। কাক-চিলরাও তো ইঁদুর পেলেই ধরে।

॥ ৩ ॥

নদীর ওপারে কাশ বনের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আছে ডুলুং। হাতে তার গুলতি। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে সে, সারা শরীরে তার আশঙ্কা ও উত্তেজনা, ফস্কে যাচ্ছে বারবার। একবার সে ঠিক লাগিয়ে দিল। একটা ছোট মতন সারস ঢলে পড়েছে।

এক লাফে বেরিয়ে এলো ডুলুং। দ্রুত দেখে নিল এদিক ওদিক। পাখিটা খোঁড়াচ্ছে, ওড়ার চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না উঁচুতে, কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠছে। ডুলুং ঝাঁপিয়ে পড়েই টাঙ্গি দিয়ে এক কোপ বসালো পাখিটার গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে পড়লো ডুলুং-এর গায়ে, কিন্তু পাখিটা এখনো মরেনি, নদীতে নেমে পড়ার চেষ্টা করছে, ডুলুং আবার গিয়ে পা চেপে ধরলো, এলোপাথাড়ি টাঙ্গি চালাতে লাগলো।

অন্য সারসগুলো প্রথমটায় ভয় পেয়ে হুস করে উড়ে গেল একসঙ্গে, একটু দূরে গিয়ে বসলো, উঁচু গলায় চিৎকার করতে লাগলো, যেন অন্য সঙ্গী-সাথীদের ডাকছে, আবার তারা লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে লাগলো। এতবড় পাখি, লম্বা ধারালো ঠোঁট, একসঙ্গে অন্তত তিরিশটা রয়েছে। তবু ওরা মানুষকে আক্রমণ করতে জানে না। শুধু চিৎকার করে।

ডুলুং যেটাকে ধরেছে, সেটা প্রায় বাচ্চাই। বেশিক্ষণ সে যুঝতে পারল না। মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলেছে ডুলুং, পাখিটার চোখ দুটো স্থির। তাড়াতাড়ি পালক আর চামড়া ছাড়িয়ে সে জলে ভাসিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু এখন তার মাথার ওপর চার পাঁচটা পাখি খুব কাছে এসে তীব্র স্বরে কঁক কঁক করছে। চিলে ছোঁ মারে, কাকেরাও মাথায় ঠোক্কর দেয়, ডুলুং ভয় পেয়ে গেল, সে প্রথমে পাখিটার ধড়টা নিয়ে দৌড়োলো, তারপর আবার ফিরে এসে মুণ্ডুটাও

কুড়িয়ে নিল, এক হাতে টাঙ্গিটা মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে ছুটলো প্রাণপণে।

পাখিদের ডাক আর আর্তনাদের মধ্যে একটা তফাত বোঝা যায় ঠিকই। রক্তাক্ত পালক খসে খসে পড়ছে, পাখিটাকে এক হাতে ঝুলিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে ডুলুং, তাকে নদীর এপার থেকে দেখতে পেয়ে গেল নাড়ু।

নাড়ুও রক্তের গন্ধ পেয়েছে।

জঙ্গলে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উবু হয়ে বসে রইলো ডুলুং। তার সারা শরীরে একটা কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। তার পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল সকাল থেকে। সেটাও কমে গেছে অনেকটা। এতবড় শিকার সে কোনোদিন পায়নি! এই শিকারের বিপদটাও সে জানে। কিন্তু ক্ষুধার্ত পেট নিয়ে চোখের সামনে এমন লোভনীয় খাদ্য দেখে সে আর মাথাটা ঠিক রাখতে পারেনি।

কেউ তাকে তাড়া করে এলো না। কোনো হৈচৈ রব শোনা গেল না।

আস্তে আস্তে পালকগুলো সব ছাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করলো সে। ওগুলোও কাজে লাগবে। মাংসগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে বুনো কলাপাতায় মুড়ে নিল। তারপর সন্ধের মুখে নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেল সে। বেশি লোককে জানানো যাবে না, আজ তাদের বাড়িতে ভোজ হবে। সে জঙ্গল থেকে পাখি মেরে এনেছে।

নাড়ু গিয়ে প্রথমেই বললো কমলাকে। তার আনন্দ এই যে জগদীশমামা এবার গুলি করে ডুলুংকে মারবে!

নাড়ুর চেয়ে কমলার বয়েস বেশী, সে বিপদের সম্ভাবনাটা ঠিক বুঝলো। সে নাড়ুর চুলের মুঠি ধরে শাসালো, খবর্দার বাবাকে বলবি না! তা হলে তোকে খেতে দেবো না! মা তোকে ভাত দেবে না!

মঙ্গলা শুনে মুখ কালো করে ফেললো। এই পাখি মারলে বাড়ির অকল্যাণ হবে। এরা অতিথি। ছোট মেয়েটার কাল থেকে জ্বর।

চিক করে মাটিতে থুতু ফেলে মঙ্গলা বললো, নিমকহারাম!

কিন্তু জগদীশকে জানানো চলবে না। জগদীশ শুনলেই সব দোষ চাপাবে লোধাদের ঘাড়ে। ডুলুংকে বাড়িতে ডেকে এনে কাজ দেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলাও দোষের ভাগী হবে।

আজ শিরীষ গাছ দুটোয় সন্ধের পরেও কোলাহল খুব বেশি।

জগদীশ আপনমনে বললো, গাছে সাপ উঠলো নাকি?

মঙ্গলা বললো, শীত পড়ে গেছে, এখন আবার সাপ আসবে কোথা থেকে?

জগদীশ বললো, একটা চ্যামনাকে পরশুও আমি দেখেছি বেগুন ক্ষেতের পাশে।

গায়ে চাদর জড়িয়ে, লম্বা টর্চটা নিয়ে জগদীশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেল শিরীষ গাছতলায়। আলো দেখে পাখিরা আরও জোরে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোনো সাপ চোখে পড়লো না।

খাওয়া দাওয়ার পর জগদীশ দাওয়ায় বসে পরপর সিগারেট টেনে যেতে লাগলো। আজ তার চোখে ঘুম নেই।

এক সময় সে মঙ্গলাকে ডেকে বললো, শোনো, একটা পাখি কাঁদছে। একেবারে ঠিক কান্নার শব্দের মতন!

সারাদিন খাটিয়ায় বসে থাকে জগদীশ, পাখির ডাক শুনতে শুনতে সে বোধ হয় পাখির ভাষাও শিখে ফেলেছে।

মঙ্গলা কান পেতে শুনলো। কঁক কঁক কঁক-এর মধ্যে শুধু একটা যেন কোঁ কোঁ কোঁ টানা সুর। কান্নার মতনই শোনায় বটে! মানুষের কান্নার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই।

খুব সাবধানে মঙ্গলা বললো, দুটো একটা বাচ্চা তো মরেই!

সে কথা ঠিক। এখানে যে দু'আড়াই মাস থাকে তার মধ্যে বেশ কয়েকটা পাখি নিজে নিজেই মারা যায়। গাছ থেকে খসে

পড়ে। শুকনো, রক্তশূন্য চেহারা। পাখিরাও বুড়ো হয়। পাখিদেরও শিশু মৃত্যু আছে।

মরা পাখিগুলোকে ওরা কুকুরটাকেও খেতে দেয় না। যত্ন করে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে আসে। গাছের ওপরের পাখিরা সব লক্ষ করে। গাছ থেকে খসে পড়া মৃত পাখিদের জন্য জীবন্ত পাখিরা কোনোদিন শোক করেনি।

কিন্তু আজ যেন স্পষ্ট কোনো কান্নার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জগদীশকে অন্যমনস্ক করার জন্য মঙ্গলা পাঁচ রকম সংসারের কথা তোলে। ধান-চাষের হিসেব নিতে নিতেও জগদীশ এক সময় বলে উঠলো. ঠিক মানুষের মতন কাঁদছে মনে হচ্ছে না? এ রকম আগে শুনেছো?

মঙ্গলা বললো, কমলা কখন থেকে পাত পেড়ে বসে আছে, তুমি খাবে না? এসো—

কান্নার আওয়াজটা শুনতে শুনতে জগদীশ অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে ছটফট করলো। পাশের ঘরে নাড়ুকে কমলা আরও অনেকবার ভয় দেখিয়েছে।

ভোর হতে না হতেই জগদীশ আবার গেল গাছতলায়। একটাও মরা পাখি নেই সেখানে।

এর পর দু'দিন পাকুড় গাছ তলায় পাথরের পাশে বসে তীক্ষ্ণ নজর রাখলো কমলা আর নাড়ু। নীতির জ্বর খুব বেড়েছে। চিলকিগড় থেকে ডাক্তার ডেকে আনা হয়েছিল তার জন্য। মঙ্গলা কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। এক একবার সে কমলার দিকে রোষের দৃষ্টিতে তাকায়। মা-মেয়েতে যুক্তি হয়েছিল যে অশুভ সংবাদটা জগদীশকে জানানো হবে না, কিন্তু এখন এক একবার মঙ্গলার মনে হয়, ডুলুং-এর শাস্তি পাওয়া দরকার। নইলে পাখির মায়ের কান্না থামবে না। ওর অভিশাপেই কি মঙ্গলাকে সারা জীবন কাঁদতে হবে?

কমলা আর নাড়ু দেখতে পায় না ডুলুংকে। সে বোধ হয় ভয় পেয়ে আর আসছে না এদিকে।

ডুলুং অবশ্য ঠিকই আসে। এই গ্রামে ঢোকে না। জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকে, বিকেলের পর গুঁড়ি মেরে এগোয় নদীর দিকে। এক ঝাঁক পাখি সন্ধের পরেও স্নান করতে ভালবাসে। লম্বা গলাটা তুলে আকাশের দিকে জল ছড়ায়। ওপরে উঠে ডানা ঝাপটায়। একজন আরেকজনের ঘাড়ে আদর করে। প্রথম চাঁদের আলোয় ওদের ধপধপে শরীরে যেন বিদ্যুৎ গেলে।

একটা মারার পর ডুলুং-এর সাহস বেড়ে গেছে। সে খুব তাকে তাকে থাকে। কাশ বনের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে। অপেক্ষাকৃত ছোট কোনো সারস দেখলে সে টাঙ্গির এক কোপে গলাটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

পাকুড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কমলা আস্তে আস্তে ডাকে, ডুলুং! ডুলুং!

কোনো সাড়া আসে না।

একদিন জ্যোৎস্না রাতে ওরা এসেছিল, এক সকালে ওরা ফিরে যেতে শুরু করে। এবার মাত্র পনেরো দিন কেটেছে।

ওদের উড়ে যাবার সময় একটা আলাদা ডাক আছে। প্রথমে একজন ডাকে, তারপর আর একজন, তারপর একসঙ্গে অনেকে। প্রথমে তিন চার জন গাছ ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, তারপর এক একটা দল শূন্যচারী হয়। দশ মিনিটের মধ্যে গাছদুটো ফাঁকা হয়ে যায়।

জগদীশ ঠিক ধরতে পেরে যায়। এ তো অন্যদিনের মতন আহারের সন্ধানে উড়ে যাওয়া নয়। তার বাড়ি ঘিরে পাখিগুলো উড়ছে, যেন বিদায় জানাচ্ছে। আকাশ সাদা হয়ে গেছে একেবারে। তাদের ডানার শব্দ ঠিক ঝড়ের মতন। তাঁদের কঁক কঁক ডাকের মধ্যে যেন ঝরে পড়ছে অভিমান।

প্রত্যেক বছর এরা মাঘ মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত থাকে। এবারে ভালো করে শীতই এলো না, তবু ওরা চলে যাচ্ছে কেন?

জগদীশ চেঁচিয়ে ডাকলো, মঙ্গলা, মঙ্গলা!

কমলা, নাড়ু, পিসিমা সবাই এসেছে, এমনকি নীতির জ্বর ছেড়েছে গতকাল, সেও ছুটে এলো উঠোনে। সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে। সবাই বুঝেছে।

জগদীশ হাহাকার করে বললো, তোমাকে বলেছিলুম না, পাখির মা রোজই কাঁদে। এবার কিছু একটা হয়েছে ওদের!

নাড়ু আর কথা চেপে রাখতে পারলো না। সে বললো, ডুলুং পাখি মেরেছে!

কমলা এক চড় কষালো নাড়ুকে।

জগদীশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ওরা আর কোনোদিন আসবে না ফিরে।

জগদীশের অনুগত সাঁওতালরা নদীর ওপারের কাশবন আর জঙ্গল ঘুরে দেখে এলো। অন্তত চার জায়গায় সাদা পালক, রোঁয়া আর রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। লোধারা নিয়মিত এই পাখি মারতে শুরু করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এই হিংস্র মানুষদের দেশে ঐ সুন্দর পাখিরা আর থাকবে কেন? সারা পৃথিবীতে কি আর জায়গা নেই?

সাঁওতালদের কাছে এই পাখি পবিত্রতার প্রতীক, তারা দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জগদীশ শুয়ে পড়েছে খাটিয়ার। তার মুখে ম্লান ছায়া। যেন এই বিশ্বনিখিল থেকে সে আজই চির নির্বাসিত হলো একটা ছোট্ট উঠোনে।

দুপুরের দিকে একটা ভিড় জমে গেল। গ্রামের অনেকেই শোক প্রকাশ করতে এলো। পাখিগুলো অসময়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল, এ তো এ গ্রামেরই অপমান। বাইরের লোকেরা এর পরে এসে ছি ছি করবে। অথচ তাদের তো কোনো দোষ নেই।

লোধাদের একটা ছেলেকে যে এ বাড়িতে আস্কারা দেওয়া হয়েছিল, সে কথা উঠলোই। গ্রামে চুরি বেড়েছে, সে কথাও বললো কেউ কেউ। পরশুদিন হাট থেকে সাঁওতাল মেয়েরা ফিরছিল সন্ধের

পর, ফুলমণি নামে একটি মেয়ের পায়ে কাঁচ ফুটেছিল, সে হাঁটতে পারছিল না ভালো করে। পিছিয়ে পড়েছিল খানিকটা। হঠাৎ দুটি ছেলে শাল জঙ্গলের আড়াল থেকে এসে তাকে চেপে ধরে। কোনো সাঁওতাল ছেলে এমন কাজ করবে না। এ নিশ্চয়ই লোধাদেরই অপকীর্তি!

উত্তেজনা বাড়তেই লাগলো ক্রমশ। সন্ধের পর প্রায় পাঁচশো লোকের বিরাট একটা দল টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে আক্রমণ করলো লোধাদের গ্রাম।

লোধারা প্রথমেই এগিয়ে দিয়েছিল ডুলুংকে। মাংস অনেকেই খেয়েছে। তবু সব দোষ ডুলুং এর। প্রথমে একটা শাবলের বাড়ি খেয়ে সে ছিটকে পড়লো মাটিতে, বাচ্চা সারসটার মতনই সে হ্যাচোড় প্যাচোড় করে পালাবার চেষ্টা করলো, পারলো না, একটা টাঙ্গির কোপ পড়লো তার ঘাড়ে।

তাকে খুন করার পরেও জনতার ক্রোধ কমলো না। মরলো আরও তিনজন, জখম হলো সাতাশ জন। পুলিস এলো আড়াই দিন পর।

জগদীশকে কেউ ধরতে ছুঁতে পারলো না। সে পঙ্গু শরীর নিয়ে দাঙ্গা করতেও যায়নি, তার বন্দুকও সে অন্যকে ধার দেয়নি। সে খাটিয়াতেই শুয়ে ছিল আগাগোড়া। দারোগাবাবু তার বাড়িতে এসে চা খেয়ে গেল।

জনা দশেক সাঁওতাল চালান হয়ে গেল সদরে। তারাও পার্টির দৌলতে জামিন পেয়ে গেল কয়েকদিন বাদে। লোধাদের তুলনায় সাঁওতালরা সংখ্যায় অনেক বেশি, সেই জন্য তাদের প্রতি দরদ আছে রাজনৈতিক দলগুলির। এরপর মামলা কবে উঠবে ঠিক নেই, সব কিছু চুকে বুকেই গেল বলা যায়।

কমলা মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে ঘুমের মধ্যে। সে যেন দেখতে পায়, একটা ঝাকড়া শিরীষ গাছের ডগায় উঠে সেই কালো কুচকুচে চেহারার যুবকটি হাত বাড়িয়ে বলছে, এই সব জঙ্গল আমার!

তারপরই সে দেখতে পায় মড়মড় করে গাছ ভেঙে পড়ছে, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। কমলা তখন হাত-পা ছুঁড়ে আঁ আঁ শব্দ করতে থাকে।

মেয়ের তড়কা রোগ হয়েছে এই ভয় পেয়ে মঙ্গলা তাকে নিয়ে গেল কনক-দুর্গার মন্দিরে। পুরুতমশাই তাকে মন্ত্রপড়া জল দিয়ে বললেন, ও কিছু নয়, বিয়ের পরই সেরে যাবে।

জগদীশ মাঝে মাঝে মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে বলে, পাখির মায়ের কান্না শুনতে পাচ্ছো? শোনো, শোনো, ঠিক সেই কাঁ কাঁ শব্দ আসছে গাছ থেকে।

মঙ্গলা অনেক শক্ত মনের মেয়েমানুষ। সে বললো, কোথায় শব্দ? ও তোমার মনের ভুল!

জগদীশ বিষণ্ণভাবে বললো, তাই হবে বোধ হয়। ওরা অসময়ে চলে গেল, আর কোনোদিন আসবে না, না গো?

মঙ্গলা বললো, দ্যাখোই না সামনের বছর কী হয়! আমরা তো আর কোনো দোষ করিনি!

জগদীশ আবার বালিশে মাথা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ক্রমে শীত এলো জাঁকিয়ে।

সাঁওতালরা তাদের বাৎসরিক শিকার করতে জঙ্গলে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এলো! হরিণ-শুয়োর তো দূরের কথা, একটা খরগোশও পায়নি এবার। সাপ, ইঁদুররাও এই শীতে গর্তে ঢুকে থাকে। জঙ্গলের আর কোনো ধক নেই। সেই জঙ্গলই বা কোথায়। কারা যেন ওর মধ্যে চাষও শুরু করেছে।

চালের দাম এই শীতে বেড়ে গেল হু হু করে।

নদী শুকিয়ে গেছে। এ বছর তেমন শাকসবজিও ওঠেনি। এ বছরটা বড় নির্দয়। সবাই পাখিদের কথা ভুলে গেছে। শীতে কোনো আনন্দ নেই। আবার কবে বর্ষা আসবে, সবাই চেয়ে আছে সেই আশায়।

উঠোনে বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ডালের বড়ি দিচ্ছে মঙ্গলা।

খাটিয়ায় পা ছড়িয়ে আধ শোওয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে জগদীশ। কুকুরটা হঠাৎ ঘ্যা ঘ্যা করে তেড়ে গেল বেড়ার দিকে। পেঁপে গাছটার তলায় কোনো মানুষ বসে আছে।

মঙ্গলা বললো, কে ছাখ তো কমলা!

কমলা আর নাড়ু এক সঙ্গে ছুটে গেল। পুরুষ নয়, একজন স্ত্রীলোক। বুড়ি। পেঁপে গাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে। গায়ে একখানা কাদা রঙের ছেঁড়া শাড়ি। মুখে অসংখ্য রেখা, মাথার চুল শনের নুড়ির মতন। ঘোলাটে ঘোলাটে চোখ।

কী চাই?

বুড়িটা ফ্যাস ফ্যাস করে কী যে বললো বোঝাই গেল না! তার গলা ভাঙা! কিংবা কোনো কালেই বোধ হয় তার কথা বলার শক্তি ছিল না।

তোমার কী চাই এখানে?

বুড়িটা কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে ঠিকই। পেটের ভেতর থেকে একটা শব্দ বার করার চেষ্টা করছে।

নাড়ু হঠাৎ চিনতে পেরে বললো, এ তো ডুলুং-এর মা। বাজারের কাছে দেখেছি!

কমলা শিউরে উঠলো। আবার লোধারা এই গ্রামে আসতে শুরু করেছে!

চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে ডুলুং, সে আর আসবে না। এই তার মা? এর মুখে এত রকম আঁকিবুঁকি যেন মনে হয় এক হাজার বছর বয়েস। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে কমলার, এখন তার আনন্দ করার সময়। তবু তার চোখ জ্বালা করে উঠলো।

বুড়িটা উঠে দাঁড়িয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে কী যেন বললো।

অতি কষ্টে তার দু'একটা শব্দ উদ্ধার করা গেল। বুড়িটা বলছে, একটু···মুড়ি!

নবাব বাহাদুর স্টেশনে গাড়ি পাঠাবেন বলেছিলেন। গাড়ি দেখে হাসতে হাসতে বাঁচি না।

স্টেশনের নাম বাগোটা, ফারাক্কাবাদ প্যাসেঞ্জার সেখানে পৌঁছলো রাত পৌনে চারটেয়। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, এ স্টেশনে উঁচু প্লাটফর্ম পর্যন্ত নেই। ট্রেন থেকে নেমে আমি আর সুবিমল অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেবাব চেষ্টা করছি, এমন সময় দুটি লোক লণ্ঠন নিয়ে এসে বললো, বাবুরা কলকাতা থেকে আইসছেন? নবাব বাড়িতে যাবেন তো? আসেন!

এই পাণ্ডববর্জিত স্টেশনেও গোটা তিরিশেক লোক নেমেছে, তার মধ্যে ঠিক আমাদের কি করে চিনতে পারলো কে জানে! হয়তো আর সবাই স্থানীয় লোক, তাদের অন্ধকারেও চেনা যায়! কিংবা আমাদের মুখ কিংবা দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কলকাতার নাম লেখা আছে। সুবিমল কিছুতেই অবাক হয় না সহজে, সপ্রতিভভাবে বললো, চল সুনীল! লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, গাড়ি আছে তো?

ছপ্ ছপ্ করছে কাদা, জুতোর জন্য চিন্তা করে লাভ নেই, আমরা প্যান্ট উঁচু করে রেল লাইন পেরিয়ে এলাম। খানিকটা পিচ্ছল ঢালু জায়গা দিয়ে নামবার পর অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, গোটা তিনেক গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটা নবাব বাহাদুরের।

সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, দিস ইজ টু মাচ্। নবাবের অবস্থা খারাপ তা জানি, কিন্তু অন্তত একটা লঝ্ঝরে ফিয়াট-টিয়াট আশা করেছিলাম।

—আমি ভাই কখ্খনো গরুর গাড়িতে চাপিনি। আমার পক্ষে সম্ভব নয় ওতে যাওয়া।

—চল্ না, একটা নতুনত্ব হবে।

—না ভাই, তার চেয়ে হেঁটে যাবো!

সুবিমল লোক দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে কতটা দূর ভাই?

—আজ্ঞে সওয়া চার মাইল!

সুবিমল বললো, এতখানি হাঁটতে পারবি?

—কেন পারবো না কেন? বেশ ভোরের হাওয়া গায়ে লাগাতে লাগাতে চলে যাবো।

—হেঁটে যেতে পারবেন না বাবু। রাস্তা বড় খারাপ!

সুবিমল বললো, চল্, এতেই উঠে পড়ি। নৌকোয় চেপেছিস তো! সেইরকমই দুলতে দুলতে যাবে—শুধু কাল সকালে গায়ে একটু ব্যথা হবে।

—গায়ে ব্যথা হলে গা টিপে দেবার লোক পাওয়া যাবে?

—যেতে পারে, নবাব বাড়ি যখন, যদি ছিটে-ফোঁটাও থাকে।

লোক দুটি বসল সামনে, গরুর ল্যাজ মুচড়ে হিঃ হেট্ হেট্ হেট্ করে উঠলো। আমি আর সুবিমল পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট ধরালাম। ক্রমে ভোর হচ্ছে, সূর্য এখনো উঠেনি, আকাশের এক দিকটা কাঁচা ডিমের কুসুম-রাঙা। ভোর বেলার সূর্যকে শেষ করে দেখেছি, মনেই পড়ে না।

সুবিমলকে বললুম, আজ অনেকদিন পর সূর্যোদয় দেখবো, ভাবতেই বেশ আরাম লাগছে।

সুবিমল আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলো, যে রকম মেঘ জমে আছে তাতে আজ আর সূর্য দেখা যাবে বলে মনে হয় না!

—এটা খুব অন্যায়! আজ একদিন চান্স পেয়েছি ভোর পাঁচটার সূর্য দেখার।

বলতে বলতেই সুবিমলের কথা অগ্রাহ্য করে আমবাগান ঠেলে সূর্য উঠে এলো। ঠিক যেন লাফিয়ে উঠলো মনে হয়, একটা টুকটুকে লাল চারনম্বর সাইজের বল্, যেন রেশমে তৈরী—এক

মুহূর্তেই ঠাণ্ডা আলোয় ভরে গেল জগৎ সংসার। সব কিছু দেখতে পেলাম। দু'পাশে ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে চলেছে গরুর গাড়ি, অদূরে আমবাগান ঘেরা একটা বিশাল পুকুর—তার নিস্তরঙ্গ জলে যেন একটা সর পড়ে আছে। দু'তিনটে মুর্গী ডেকে উঠলো সমস্বরে—এ ছাড়া চতুর্দিকে একটা ঠাণ্ডা স্তব্ধতা। রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের চিক্কন সবুজ পাতায় কাঁচা রোদ্দুরের বিচ্ছুরিত লাল আলো পড়ে অদ্ভুত বর্ণ তৈরী হয়েছে, গোটা গাছটাকে মনে হয় একটা ঝাড় লণ্ঠন!

আমি সুবিমলকে বললাম, যাই বলিস্ এখনো এক এক সময় প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে বেশ ভালোই লাগে।

সুবিমল বললো, এক এক সময় কেন? প্রকৃতি ছাড়া আর কোথাও কোন সৌন্দর্য আছে নাকি?

—কেন, মেয়েদের?

—মেয়েদের সৌন্দর্য যদি তেমনই হবে, তবে মানুষ মেয়েদের দেখলেই অন্ধকার ঘরে নিয়ে যেতে চায় কেন?

একথার উত্তর দিতে আমি হাসলাম।

সুবিমল বললো, হাসলি কেন? উত্তর দে!

—সকালবেলাতেই এসব প্রশ্ন না তুললেই নয়! এখন এই ভোরের দৃশ্য দেখতে আমার খুবই ভাল লাগছে বটে, কিন্তু পুকুরঘাটে যদি একটা মেয়ে দেখতাম, তা হলে তার দিকেই আমার চোখ যেত। এটা ভাই সোজা সত্যি কথা!

—আমারও যেত! ঐ ছাখ্—

এক ঝাঁক হাঁস তাড়াতে তাড়াতে ছুটে যাচ্ছে দুটি মেয়ে। তারা ঠিক বালিকা নয়, যুবতীও নয়। যুবতীর চেয়ে কিছু কম, বালিকার চেয়ে কিছু বেশী—অথচ গ্রামের মেয়েদের ঠিক কিশোরী বলা যায় না কখনো। মেয়ে দুটিকে সুন্দরী বলা যায় না, এই সকালের মসৃণ আলোতেও তাদের দরিদ্র্যের বিবর্ণতা চাপা পড়েনি, একটা মেয়ে

হাঁসগুলোর ছটফটানিতে বিরক্ত, একজন খুশী। একটু পরেই তারা বাঁশবনের ওধারে আড়াল হয়ে গেল!

রাস্তায় হাঁটুসমান কাদা, গরুর গাড়িটা যাচ্ছে খুবই আস্তে. আমি বললাম, নবাব বাহাদুরকে দোষ দেওয়া যায় না। এই রাস্তায় গরুর গাড়ি ছাড়া আর কিছু চলাই তো অসম্ভব!

সুবিমল চিন্তিত ভাবে বললো, এই একটাই যদি স্টেশনে যাবার রাস্তা হয়, তা হলে তো মুস্কিল। কাল ফিরবো কি করে। সঙ্গে অনেক লটবহর থাকবে!

—আবার গরুর গাড়ি! চিন্তা কি?

—যদি আজও বৃষ্টি হয়, তাহলে এ রাস্তায় বোধহয় গরুর গাড়িও চলবে না!

—এখানকার লোকজন বর্ষাকালে যাতায়াত করে কি করে?

সুবিমল মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত ভাবে হেসে বললো, এখানকার লোকজন কাদা ভেঙেই যায়, অথবা যায় না। কোনো ব্যস্ততা নেই। বাংলাদেশের অনেক গ্রামই এই রকম—তোর মতন শহর বাবুরা কোনো খবর রাখে না। মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ!

আমিও কি অদ্ভুত ভাবে হাসতে জানি না। বছর দু'এক আগে একবার বিলেত ঘুরে আসার পর থেকেই সুবিমলের দেশপ্রীতি খুব বেড়ে গেছে! আমিও সুবিমলের অনুকরণে হেসে বললুম আমি পূর্ব বাংলার যে গ্রামে জন্মেছিলুম, সেখানে এরকম রাস্তাও নেই। সেখানে লোকে যাতায়াত করে নৌকায়। আমি গরুর গাড়ির ব্যাপারটা তেমন দেখিনি!

—কবে কোন্ কালে পূর্ববঙ্গে ছিলি, এখনও তাই ধুয়ে খাচ্ছিস।

—কিন্তু গ্রাম দেখলেই যে আমার সেই গ্রামটার কথাই শুধু মনে পড়ে—ধান ক্ষেতের ওপর দিয়েও নৌকো চলে সেখানে।

গর্তে গরুর গাড়িটার চাকা আটকে গেছে। লোক দুটো নিঃশব্দে নেমে পড়ে চেষ্টা করছে ঠেলে তুলতে। চটচটে আঠালো কাদা। একটু আগে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে যে-টুকু খুশী খুশী লাগছিল—

এখন এই বিচ্ছিরি কাদায় ভরা রাস্তা দেখে সেটুকু অন্তর্হিত হয়ে গেছে। লোকদুটো প্রাণপণে ঠেলছে গাড়িটা, গরু দুটোর পিঠ বেঁকে গেছে, তবু গাড়ি ওঠে না।

সুবিমল নিম্নস্বরে বললো, আমরা দু'জনে গাড়িতে বসে আছি আর ওরা ঠেলছে, এটা বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে!

—আমাদেরও নামা উচিত?

—বড্ড কাদা, মাইরি! প্যাণ্ট-ফ্যাণ্টের আর কিছু থাকবে না!

—তাহলে? হয় আমাদের অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য না করা উচিত, অথবা কাদার মধ্যে নেমে পড়ে ঠেলতে হয়। কোন্‌টা করা হবে? আমরা নবাব সাহেবের অতিথি—ওরা অবশ্য আশা করে না—আমরা গাড়ি ঠেলবো।

—নাঃ, নেমে পড়াই উচিত!

জুতো খুলে রেখে আমরা নেমে পড়তেই পায়ের ডিম পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। থক্‌থকে এঁটেল মাটি কামড়ে ধরলো যেন পা। লোক দুটো একবার ক্ষীণ আপত্তি করলো বটে, না, না, বাবু, আপনারা কেন কাদার মধ্যে নামবেন···, কিন্তু মনে হলো, ওরা যেন আশাই করছিল আমরা নামবো। সম্ভবত এরকম অবস্থায় স্বয়ং নবাব সাহেবও হাত লাগাতে বাধ্য হন।

গাড়ি উঠলো বটে কিন্তু আর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঠেলাঠেলির সময় আমার চশমাটা ছিটকে গিয়ে লাগলো গাড়ির চাকায়—কাচ ভাঙলো না বটে, কিন্তু একটা ডাঁটি গেল আলগা হয়ে, সেটা তুলতে গিয়ে হাত ডোবাতে হলো কাদায়। সেই রকম, হাতে পায়ে চশমায় কাদা মাখা অবস্থায় পৌঁছুলাম নবাব বাড়িতে।

নবাবকে একটা কুঁড়েঘরের বাসিন্দা দেখলেও আমি অবাক হতাম না। মনে মনে তৈরী হয়েই ছিলাম। খানিকটা যেন জানতামই, গিয়ে দেখবো একটা আধবুড়ো লোক ভাঙা লঝ্‌ঝরে ছোট বাড়িতে থাকে, পুরোনো কালের কথা তুলে বড় বেশী বক্‌বক্‌ করে। আগ্রা—লক্ষ্ণৌতে দেখেছি অনেক টাঙ্গাওয়ালা বছরে একখানি জরির

পোশাক পরে ট্রেজারি থেকে একটাকা দেড় টাকার সরকারী ভাতা নিয়ে আসে। তারা সবাই আমীর ওমরাহের বংশধর। কাশীতে শংকর আদিত্য বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, একটা স্টেশনারি দোকানের মালিক, দারুণ কৃপণ আর বাচাল—সেই ভদ্রলোকও বলেছিলেন তিনি প্রতাপাদিত্যের বংশের একটা শাখার উত্তরাধিকারী।

কিন্তু নবাব সাহেবের বাড়ি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছে নিয়ে ভালো করে তাকিয়েও ঠিক বিশ্বাস হয় না। গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় একটাও পাকা বাড়ি দেখিনি, খুবই গরীবদের গ্রাম—আর এই নবাব বাড়ি প্রায় সিকি মাইল এলাকা জুড়ে এক বিরাট প্রাসাদ! অধিকাংশ জায়গাই ভাঙা, অনেক ঘরেরই ছাদ নেই, সেখানে জন্মেছে বট, অশ্বত্থ, চত্বর জুড়ে পড়ে আছে নানা রকম ভাঙা মূর্তি, ডানা ভাঙা পরী আর নাক কান ভাঙা প্রহরী। সিংহদ্বারের সিংহই মুণ্ডহীন, তবু তাদের আয়তন এবং দেহের কয়েকটি রেখা দেখেই বোঝা যায়, কি গর্বোদ্ধত ছিল তাদের চেহারা এক সময়। সম্পূর্ণ প্রাসাদটিই যে এক সময় দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল, তাও বোঝা যায়, যদিও অক্ষত আছে সামান্য অংশই।

আমি সুবিমলের দিকে তাকিয়ে বললাম, একি?

সুবিমল মুচকি হেসে বলে, আসল নবাবকে দেখে আরও অবাক হবি! তোর মনে হবে ছবির বই থেকে উঠে এসেছে একজন মানুষ।

—তুই নবাবকে দেখেছিস?

—হ্যাঁ। দু'বার।

—আমাকে বলিস নি তো আগে। তুই যে বলেছিলি চিঠিতে যোগাযোগ তোর সঙ্গে?

—তোকে বলিনি ইচ্ছে করেই। আস্তে আস্তে আরও অনেক কিছুই দেখবি।

—কিন্তু এ বাড়িতে আমরা থাকবো কোথায়? এতো পুরোটাই ভাঙা মনে হচ্ছে।

—ছাখ না কি হয় !

চত্বরের মধ্যে গরুর গাড়ি থেকে নামলুম আমরা। চত্বরটার ঠিক মাঝখানে খানিকটা ঘেরা জায়গা, এক সময় ওখানে ফোয়ারা বসানো ছিল মনে হয়, এখনও নোংরা জল জমে আছে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তুটি শ্বেতপাথরের জলকন্যা। মূর্তি বানানো ইসলামে নিষিদ্ধ জানতাম, কিন্তু এ বাড়িতে সারাসেজি বা হিন্দু প্রভাব পড়েছে মনে হয়। চতুর্দিকে মূর্তির ছড়াছড়ি। সুবিমল এই সব পুরোনো মূর্তির ব্যবসা করে—সে খুঁজে খুঁজে দেখলো কোনোটা অক্ষত আছে কিনা। চত্বরের এক কোণে পাথরে বাঁধানো একটা বিরাট কুয়ো, অতবড় কুয়ো এর আগে দেখেছি শুধু ফতেপুর সিক্রিতে। সেই কুয়োর জল তুলে হাত পায়ের কাদা ধুয়ে নিলাম।

লোক তুটি জানালো, কুমার সাহেব বোধহয় এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। আপনারা আসুন, একটু বিশ্রাম করবেন। তারপর শুরু হলো সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রা। মনে হলো যেন চলেছি তো চলেইছি। ত'তিনটে দরদালান পেরিয়ে, ভাঙা ইঁট পাথর সরিয়ে সরু রাস্তা তৈরী হয়েছে—সেই পথ ধরে। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলাম প্রায় বাড়ির শেষ প্রান্তে, সে জায়গাটা একটু পরিচ্ছন্ন—একতলার ঘরগুলো মোটামুটি অটুট আছে—দোতলার ঘরগুলিতে ফাটল ধরেছে। একতলার একটা ঘরে বসানো হলো আমাদের—বড্ড পুরোনো আমলের সোফা কৌচে সাজানো ঘরটা—সব আসবাবই মলিন বিবর্ণ, ছাদ থেকে ঝুলছে বিরাট টানা পাখা—তার বর্ডারের রুপোলি জরি ধুলোর আস্তরণের মধ্যে সহজে বোঝা যায় না। মেঝেতে চটের মত যে জিনিসটা পাতা, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবিষ্কার করতে হয় এক সময় সেটা ছিল দামী গালিচা।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগছে ?

আমি বললাম, ঘরটা বেশ অন্ধকার ! নবাব বাদশারা কি আগে এইরকম অন্ধকার ঘরে থাকতেন নাকি ?

—নবাব বাদশারা কেউ একতলার ঘরে থাকতেন না! দোতলার সব ঘর ভেঙে পড়েছে কি না এখন?

— এরা কি সিরাজদ্দৌল্লার বংশের কেউ নাকি?

—সিরাজদ্দৌল্লার বংশের কেউ শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল নাকি?

—সিরাজদ্দৌল্লার মাসী-পিসী কারুর বংশ হ'তে পারে?

—কে জানে, জানি না। তা নয় বোধহয়। এমনিই জমিদার বাড়ি ছিল হয়তো।

—তা হলে নবাব বাড়ি বলে কেন সবাই!

—অনেক মুসলমান জমিদারই এক সময় ছোটখাটো নবাব হয়ে উঠেছিল। শুনতে পাচ্ছিস?

—কি?

—শানাই বাজছে। এবার নবাবের ঘুম ভাঙবে।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, শানাই বাজছে বটে, কিন্তু রেডিওতে। তুই বুঝি ভেবেছিলি, নহবৎখানা থেকে শানাই বাজিয়ে নবাবের ঘুম ভাঙানো হচ্ছে?

নবাব নামলেন একটু বাদেই। সুবিমল অতিশয়োক্তি করে নি, সত্যি ছবির বইয়ের মানুষই মনে হয়। অমন ফর্সা রঙের কোনো পুরুষ মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। সাহেবদের ফর্সা রং এ ধরনের নয়! সত্যিকারের গৌরবর্ণ বলে একেই। চোখ দুটো টানা টানা, টিকোলো নাক, কালো কুচকুচে চুল—সব মিলিয়ে কার্তিক ঠাকুরের মতন। মেয়েলি চেহারা মনে হতে পারতো—কিন্তু কপালের বাঁ পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ মুখখানাতে খানিকটা পৌরুষ এনে দিয়েছে! তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস হবে নবাবের, পাজামা আর গেঞ্জির ওপর একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে এসেছেন।

সুবিমলের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললো, আসুন আসুন! রাস্তায় কোনো অসুবিধে হয় নি তো?

সুবিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, না! আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার বন্ধু সুনীল গাঙ্গুলি, আর ইনি হলেন মেহদী আলি সেলজুক্!

আমার দিকেও সহৃদয় ভাবে দু'হাত বাড়িয়ে মেহদী আলি বললো, আপনি সুবিমলবাবুর দোস্ত তার মানে আমারও দোস্ত। রাস্তায় আসতে কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই? গরিবের দেশ—রাস্তাঘাটের অবস্থা বড্ড খারাপ।

আমি বললুম, না, কষ্ট তেমন হয়নি। বরং অন্যরকম লেগেছে, একথাই বলা যায়।

ঘর ফাটিয়ে হেসে নবাব বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, অন্যরকম! কলকাতায় ট্রামে বাসে চড়াও তো কম কষ্টকর নয়! আমি একবার দশ নম্বর বাসে চেপেছিলুম, উঃ, কি অবস্থা, মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে—এই জন্যেই তো কলকাতায় যাই না বেশী।

এতবড় একটা বিরাট প্রাসাদের মালিক, তরুণ নবাব কলকাতায় গিয়ে বাসে চড়বেন, এটা যেন ঠিক ভাবা যায় না। গাড়ি না থাক্, অন্তত ট্যাক্সি। আমি বললুম, আপনার নাম সেলজুক? পারস্যে যে বিখ্যাত সেলজুক বংশ ছিল, আপনারা কি তারই কোনো শাখা?

নবাব একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললো, পারস্যেও সেলজুক বংশ ছিল বুঝি? কি জানি, আমি ইতিহাস-টিতিহাস তেমন পড়িনি। আমি ঠিক জানি না।

—আপনারা কি তাহলে মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ির···

—না, না, আমার বাবার দাদামশাই এমনি ছোট জমিদার ছিলেন! আমার বাবা পেয়েছিলেন দাদামশাইয়ের সম্পত্তি। চলুন, হাত মুখ ধুয়ে নেবেন। সকালে চা খান, না কফি?

—যে কোনো একটা—

এই সময় হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় চিৎকার শুনতে পেলাম, কাশেম! কাশেম! আমার আতরদান কোথায়?

নবাব তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে ডাকলো, কাশেম! কাশেম! ওপরে যা—

কাশেম নামে কেউ সাড়া দিল না অবশ্য। সুবিমল আর আমি চোখাচোখি করলাম। আমার চোখে প্রশ্ন। সুবিমলের চোখে

উত্তর নেই। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলো। বনেদী খানদানী বাড়ির কোনো মেয়ের পক্ষে অত চিৎকার করে ডাকা ঠিক সঙ্গত নয়। তা ছাড়া এই সকালবেলা আতরদানেরই বা খোঁজ কেন? হয়তো মেয়েটি জানে না—বাড়িতে অতিথি এসেছে। কাশেম নামে যাকে ডাকা হচ্ছে, সে হয় আশেপাশে নেই অথবা সাড়া দিতে চায় না।

নবাব আবার ঘরে ঢুকে বললেন, চলুন, একটু চা টা খেয়ে নেবেন। এখানে কিন্তু পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। আপনাদের নিশ্চয়ই রোজ সকালে চায়ের সঙ্গে টোস্ট খাওয়া অভ্যেস!

সুবিমল বললো, আমাদের কি অভ্যেস না অভ্যেস তা নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না। আমাদের কোনো ধরাবাঁধা অভ্যেস নেই! আপনি যা ব্যবস্থা করবেন—

—আসুন, এদিকে আসুন।

সিঁড়িটাও বেশ অন্ধকার, দেওয়ালে বড় বড় ফাটল, সিনেমায় যেমন দেখি নবাব বাদশাদের বাড়িতে সিঁড়ির কাছে দেয়ালে ঢাল-তলোয়ার ঝোলানো থাকে—সে রকম কিছু এখানে নেই। দেয়ালের গায়ে পদ্মফুল ও লতাপাতার মোটিফ। হয়তো ছিল এককালে ঢাল তলোয়ার—বিক্রী হয়ে গেছে এখন।

দোতলায় উঠলে রীতিমতন ভয় করে। দোতলার ঘরের ছাদগুলোর অবস্থা শোচনীয়, এক জায়গায় তো শালবল্লা দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িটাকে দেখলে মনে হয়—দু'একদিন আগেই এখানে দারুণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে।

নবাবের সঙ্গে কি রকম ভাবে কথা বলতে হবে, সে সম্পর্কে আমার মনে একটু অস্বস্তি ছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো কিছু রীতি-নীতি মানতে হবে—কুর্নিশ করতে না হলেও সম্বোধন করতে হবে বোধহয় সম্ভ্রমের সঙ্গে। কিন্তু আমাদেরই বয়েসী একটি ছেলে চালচলনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। এমন কি, আব্বা, ফুফা, খালা—এ সমস্ত কথাও ব্যবহার করছে না অন্তত আমাদের সামনে। পানি না

বলে জল বললো। কথায় মাঝে মাঝে দু'একটা ইংরেজি শব্দও থাকে. উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। মোটামুটি আধুনিক যুবকই বলা যায়।

সুবিমল বললো, এতবড় বাড়ি, কোনদিন বোধহয় সারানো টারানো হয়নি, তাই না?

মেহদী আলি ক্ষীণ হেসে বললো, এই গোটা বাড়ি সারাতে যা খরচ পড়বে, সেই টাকায় আপনাদের কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে একটা নতুন বাড়ি হতে পারে।

—কিন্তু আপনার ঘরের ছাদ তো যে-কোনদিন ভেঙে পড়তে পারে?

—কবে ভেঙে পড়বে, সেই প্রতীক্ষাতেই তো আছি!

—তার মানে?

আবার সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চিৎকার শোনা গেল, কাশেম! কাশেম! আমার আতরদান কোথায়?

খুব কাছ থেকেই আওয়াজ, তিন-চারখানা ঘর পরে। মনে হয় যেন জানলার কাছে একটি মেয়ের নীলরঙা শাড়ির আঁচলও দেখতে পেলাম। কিন্তু মুখ দেখিনি।

মেহদী আলি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে শান্ত গলায় বললো, জুলি, কাশেম এখানে নেই, আমিও খুঁজে দেখেছি।

—তুমি চুপ করো!

—জুলি, আমার কাছে দু'জন মেহমান এসেছেন!

—কাশেম কোথায়? কাশেম? আমি এখন বাইরে বেরুবো।

—কাশেম এলে আমি পাঠিয়ে দেবো।

—তুমি চুপ করো! কাশেম—

আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুবিমলের মুখে মিটিমিটি হাসি। কোনো অবস্থাতেই অবাক হবে না, ওর এই রকম প্রতিজ্ঞা। মেহদী আলি আবার আমাদের কাছে এসে বললো, চলুন, আপনাদের শুধু শুধু দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে এলাম অন্যপ্রান্তে। আসবার সময় আমি

আড়চোখে সেই ঘরটার দিকে তাকিয়েছিলাম—যেখান থেকে চিৎকার আসছিল। এবারও মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম না। মেয়েটি তখন বাইরের দিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল কাশেমের নাম ধরে। মনে হয় ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েস মেয়েটির, শরীরের গড়ন সুন্দর --খুব দামি একটা শাড়ি পরে আছে।

খাবার ঘরে ঢুকে আর একবার বিস্ময়। টেবিলের ওপর তিনটে চেয়ারের সামনে অন্তত দশ বারোটি প্লেটে খাবার সাজানো কোনোটায় লুচি, কোনোটার রাবড়ি, কোনোটায় ফলের রস, ডিম, চীজ সব কিছুই। আমি স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠলুম, একি করেছেন কি, এত খাবার।

সুবিমল উৎফুল্ল ভাবে বললো, আমার অবশ্য আপত্তি নেই! নবাবী খানা যে একটু স্পেশাল হবে, জানতুমই!

আমি বললুম, তা বলে, এই সকালবেলা এত খাবার খাওয়া যায়? সেলজুক সাহেব, আপনি কি রোজ এত খাবার খান?

—আমাকে সেলজুক সাহেব বলবেন না। শুধু মেহদী বলে ডাকবেন। আমিও আপনাকে সুনীল বলবো।

—কিন্তু এত খাবার, আপনি রোজ খান।

—মানুষ রোজ যা খায়, অতিথিকেও তাই খেতে দিলে অতিথির অপমান করা হয় না!

—কিন্তু আপনি আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলে—আমাদের লজ্জা লাগবে।

সুবিমল ততক্ষণে বসে পড়েছে। বললো, লজ্জা করলে মানুষ বেশী খায়। দেখবেন, সুনীল একটা কিছুও ফেলবে না।

দেখা গেল মেহদী আলি সাহেবী কেতাতেও অভ্যস্ত। চেয়ারে বসবার আগে বললো, আমার স্ত্রী এখন আসতে পারছেন না, সেজন্য তাঁকে ক্ষমা করবেন!

আমি বললুম, না, না, তাতে কি আছে!

মেহদী আলি আবার মৃদু স্বরে বললো, আপনারা হয়তো ভাবছেন,

আমার স্ত্রী পাগল! তা কিন্তু নয়! হঠাৎ হঠাৎ ওর এই রকম মেজাজটা একটু বেশী খারাপ হয়ে যায়! আপনারা হয়তো অপমানিত মনে করছেন, কিন্তু আমি ওঁর হয়ে মাপ চাইছি।

সুবিমল ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, আরে ছি ছি, ওসব কথা বলছেন কেন? আমরাই এসেছি আপনাকে জ্বালাতন করতে।

—জ্বালাতন করতে কি বলছেন! এইরকম গ্রামের মধ্যে পড়ে থাকি, শহর থেকে যদি কখনো বন্ধু-বান্ধব আসেন, আমার খুব ভালো লাগে! আপনারা কিন্তু সাতদিনের মধ্যে ফিরতে পারবেন না!

আমি বললাম, সাতদিন? অসম্ভব! আমি মোটে তিনদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

—ছুটি? কিসের ছুটি?

—বাঃ, আমাকে চাকরি করতে হয় না? আমি তো আর সুবিমলের মতন ব্যবসা করি না!

—আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনারা দুজনে পার্টনার।

—এক হিসেবে পার্টনারও বলতে পারেন। সুবিমল ব্যবসায় যা লাভ করে, সেটা খরচ করার ব্যাপারে আমি পার্টনার!

শব্দ করেই হাসলো মেহদী আলি, কিন্তু সেটা খুব স্বতঃস্ফূর্ত মনে হলো না। বোঝা যায়, তার মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে। তবু কথা চালাবার জন্য বললো, যাই বলুন, সাতদিনের আগে আপনাদের ছাড়ছি না?

—এবার সত্যি থাকা হবে না, পরে না হয়—

—যাবার চেষ্টা করুন তো, জোর করে পাইক বরকন্দাজ দিয়ে আটকে রাখবো!

—পাইক বরকন্দাজ তো এ পর্যন্ত দেখলাম না একজনও!

তিনজনেই হাসতে লাগলাম। একজন লোক মেহদী আলির কানের কাছে এসে কথা বললেন। খুব আস্তে বললেও আমি শুনতে পেলাম, হুজুর, কাশেম এসেছে। মেহদী আলির ফর্সা মুখখানা টকটকে

লাল হয়ে উঠলো। মেহদী আলি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, কাশেম বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে ?

লোকটি ফিসফিস করে বললো, দেউড়ি পেরিয়ে এসেছে।

—চাবুকটা নিয়ে যা ! কাশেম যদি এমনি না যায়, চাবুক মেরে ওকে তাড়িয়ে দিবি !

লোকটি নিষ্ক্রান্ত হতেই মেহদী আলি আমাদের দিকে ফিরে বললো, কিছু মনে করবেন না ! এমনিই সাধারণ একটা ব্যাপার।

সুবিমল ঠোঁট কাটা। মৃদু হেসে বললো, খুব সাধারণ নয়, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমাদের তা জানবার কৌতুহলও নেই।

মেহদী আলি সরু চোখে তাকালো একবার সুবিমলের দিকে। হয়তো এরকম মুখের ওপর উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা শোনার অভ্যাস তার নেই। কিন্তু পরক্ষণেই সে সামলে নিয়ে বললো, আপনাদের আর কি দেবো বলুন ? আর একটা করে ডিম দিই ?

একজন পরিচারক দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল, সেই মুহূর্তেই সে একটা ট্রে-তে করে তিনটে ডিম এনে হাজির করলো। মেহদী আলি সেই ডিমগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে কি একটা ভঙ্গি করতেই একটা ডিম লাফিয়ে তার হাতে উঠে এলো !

আমি আঁতকে উঠে এক পাশে সরে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে। সুবিমল কিন্তু নির্বিকার। ডিমটার খোলা ছাড়ানো নেই, মেহদী আলি সেটা কানের কাছে নিয়ে যেতেই সেটার ভেতর থেকে একটা মুর্গী ডেকে উঠলো। মেহদী আলি ডিমটা আলোর দিকে বাড়িয়ে বললে, নিন্, এটা বেশ ভালো হবে—

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। ডিমটা নেবো কি নেবো না ইতস্তত করছি ! সুবিমল বললো, বাঃ, আপনি ম্যাজিকটা বেশ ভালোই শিখেছেন তো !

মেহদী আলি স্মিত হাস্যে বললো, আপনাকে তেমন ইমপ্রেস করতে পারিনি মনে হচ্ছে ! সুনীলবাবু কিন্তু বেশ চমকে গিয়েছিলেন !

সুবিমল বললো, না চমকালে আর ম্যাজিক কি! আচ্ছা, আপনি এই গোটা টেবিলটা মাটি থেকে ওপরে উঠাতে পারেন? ওঠান্ তো!

মেহদী আলি অনর্গলভাবে হাসলো। বললো, ঐ একটা জিনিস হয় না। ম্যাজিসিয়ানদের কোনো একটা ব্যাপার দেখাবার জন্য হুকুম করলে তারা তা দেখায় না! হঠাৎ চমকে দেওয়াই ম্যাজিসিয়ানদের বৈশিষ্ট্য! ঐ দেখুন, আপনার বুক পকেটে একটা ডিম! ফেটে যাবে, ফেটে যাবে!

—অ্যাঁ! সুবিমল এবার সত্যি চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি বুক পকেটে হাত দিতেই একটা ডিম বেরিয়ে পড়লো।

মেহদী আলি আর আমি গলা মিলিয়ে হাসতে লাগলুম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কতদিন ধরে ম্যাজিক শিখছেন?

—দু'তিন বছর। এই শখ নিয়েই সময় কেটে যায়!

খাওয়ার পব আমরা গোটা বাড়িটা দেখতে বেরুলাম মেহদী আলির সঙ্গে। মাত্র সামান্য কিছুটা অংশই আস্ত রয়েছে, বাকি সবই ভাঙাচুরো। এ বাড়ির মধ্যে ঘুরতে বেশ ভয়-ভয়ই করে, কখন কোথায় কি মাথার ওপর ভেঙে পড়বে তার ঠিক কি? পেছন দিকের একটা দরজায়, মেহদী আলির সেই অনুচরটি তখনও চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কেউ নেই অবশ্য। সেইদিকে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম, কাশেম নামের লোকটিকে দেখার কৌতূহল ছিল আমার।

সুবিমল এসেছে মেহদী আলির কাছ থেকে কিছু পুরোনো কালের জিনিসপত্র কিনতে। আমি তার অকারণ সঙ্গী। কিন্তু সুবিমলের ভাবভঙ্গির মধ্যে এই সব জিনিসের ক্রেতা-সুলভ কোনো বিনয় নেই। ও কথা বলছে রীতিমতন সমান সমান সুরে। থিয়েটার রোডের একটা কিউরিও শপে সুবিমলের সঙ্গে আলাপ মেহদী আলির, সেই থেকে প্রায় বন্ধুত্ব।

সুবিমল বললো, চলুন. এবার আপনার জিনিসপত্রগুলো দেখা যাক!

—দেখবেন, দেখবেন, এত ব্যস্ত কেন?

—কোথায় আছে সেগুলো?

—ঐ যে সাদা মসজিদটা দেখছেন, ওরই তু'খানা ঘরে রাখা আছে অনেক পুরোনো জিনিস! ওটা আমাদের পারিবারিক মসজিদ। সব জিনিসপত্র ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—দেখা-শুনো করার কেউ নেই—চলুন। মসজিদটায় একটু ঘুরে আসি!

—এখন গিয়ে এমনি মসজিদ দেখতে পারেন, কিন্তু জিনিসপত্র কিছুই দেখতে পাবেন না। ও ঘরের চাবি আছে মৌলবী সাহেবের কাছে—

—মৌলবী সাহেব এখানে নেই?

—আরে দাদা, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখানে কয়েকদিন থাকুন। আমাদের জায়গাটা দেখুন, জিনিসপত্র তো আছেই! কতদিন কথা বলার লোক পাই না! আমরা আবার শহরে গেলে ঠিক স্বস্তি পাই না! মৌলবী সাহেব গেছেন মুর্শিদাবাদ সদরে, পাকিস্তান থেকে ওঁর এক আত্মীয় এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে।

—কবে আসবে?

—যদি বলি, এক সপ্তাহ বাদে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! না, না, কাল সকালেই আসবেন।

তুপুরে আবার সেইরকম বিরাট খাবারের আয়োজন নবাব সাহেব এবারও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরানো হয়েছে আমাদের জন্য, তু' রকম মাংস—পাঁঠা, মুর্গী, সেইসঙ্গে ছ'সাত রকমের মিষ্টি। জামাইরাও আজকাল এরকম আদর পায় না।

মেহদী আলি এবারও ভদ্রতা করে বললো, আমার স্ত্রী এখনও

তৈরী হতে পারেন নি, তিনি আপনাদের খেতে বসাতে পারলেন না, এজন্য কিছু মনে করবেন না !

আমি শশব্যস্ত বলে উঠলুম, না, না, তাতে কি হয়েছে !

বনেদী মুসলমান পরিবারের বউ আমাদের সঙ্গে এসে এক সঙ্গে খেতে বসবে, এটা আমরা আশাই করিনি। অনেক হিন্দু বাড়ির বৌরাও তো অতিথিদের সঙ্গে খেতে বসে না। এখন আর কাশেম কাশেম ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, বারান্দা দিয়ে আসবার সময়েও জানলায় কারুকে দেখিনি !

মেহদী আলি আবার বললো, আমার আম্মা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।

আমি আর সুবিমল দু'জনেই সসম্ভ্রমে বললুম, নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

সুবিমল বিলিতি আদব কায়দায় অভ্যস্ত, সে মেহদী আলির মাকে দেখে সম্মান করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মেহদী আলির মায়ের বয়েস পঁয়তাল্লিশের বেশী না, এককালে অসাধারণ রূপসী ছিলেন, কিন্তু এখন চোখে-মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। অত্যন্ত ঘরোয়া ভাবে তিনি বললেন, বসো বাবা, বসো ! তোমরা আমার ছেলের বয়সী, আমার ছেলেরই মতন—

মুসলমান মহিলাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা দস্তুর কিনা আমাদের জানা নেই ! সুবিমল হাত জোড় করে নমস্কার করলো, আমি সেলামের ভঙ্গিতে একটা হাত কপালে তুললাম। আমাদের অনেকেরই ধারণা, বনেদী মুসলমান বাড়িতে বুঝি বাংলায় কথা বলা হয় না, কিন্তু এ বাড়িতে দেখছি বাংলাই একমাত্র ভাষা। মেহদী আলির মায়ের উচ্চারণ শুনে মনে হয়, কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছেন !

মা বললেন, বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করতে পারিনি, তোমাদের কষ্ট হবে খেতে !

বুঝলুম ! এরই নাম নবাবী বিনয়। সুবিমল মৃদুহাস্যে বললো, হ্যাঁ, কষ্ট করেই এতগুলো খাবার খেতে হবে অবশ্য ?

—সব একটু করে চেখে দেখতে হবে কিন্তু। না বললে শুনবো না! তোমরা এক হিসেবে আমার ছেলের কুটুমও তো বটে!

কুটুম কথাটা শুনে একটু অবাক হলুম। হয়তো মেহদী আলির মা বন্ধুর বদলে কুটুম বলে ফেলেছেন! মেহদী আলি লাজুক ভাবে মুচকি মুচকি হাসছে। মা আবার বললেন, আমার বৌমা তো তোমাদের হিন্দু ঘরের মেয়ে! এই বাঁদরটা যখন বহরমপুরে পড়তে গিয়েছিল, তখন নিজে পছন্দ করে শাদী করেছে!

—আঃ আম্মা, ওসব কথা এখন থাক্!

মা বাধা না মেনে বললেন আমাদের দিকে তাকিয়ে, বাঁদর বললুম কেন জানো? বহরমপুরে মেহদী থাকতো বৌমাদের পাশের বাড়িতে। এমন বাঁদর ছেলে, পাশাপাশি ছাদ তো, এ ছাদ থেকে ও ছাদে লাফিয়ে বৌমার সঙ্গে গিয়ে ভাব করেছিল।

দুঃসাহসিক প্রেমের গল্প। অন্য কারুর সম্পর্কে শুনলে তেমন আশ্চর্য হতুম না। কিন্তু একজন তরুণ নবাবকে ছাদ লাফাবার ভূমিকায় ঠিক যেন মানানো যায় না। বস্তুত এ বাড়ির আর সব কিছুই সাধারণ মধ্যবিত্ত ধরনের, কিন্তু এই বিশাল ভাঙা প্রাসাদটার পটভূমিকাই সব কিছু যেন রহস্যময় করে দিয়েছে!

মা বললেন, খাও বাবা, তোমরা খেতে খেতে গল্প করো। আমি একটু গা ধুতে যাই!

মা চলে যাবার পর আমি মেহদী আলিকে জিজ্ঞেস করলুম, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনার কি একটিই স্ত্রী?

অট্টহাস্য করে মেহদী আলি বললো আপনি কি আশা করেছিলেন, আমার এখানে একটা হারেম দেখতে পাবেন?

আমি অপ্রস্তুত ভাবে বললুম, না, ঠিক তা নয়!

সুবিমল আমাকে বাঁচাবার জন্য বললো, আমি কিন্তু মশাই আপনার মতন অবস্থায় থাকলে অন্তত চারটে বিয়ে করতুমই!

মেহদী আলি বললো, আপনি জানেন না তাই? একজন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেই···আপনাদের হিন্দুদের মেয়েরা···

সুবিমল বললো, সে আর আমাকে বলতে হবে না! আপনাকে একটুও হিংসে করছি না মশাই! আমি তো আর মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনি! যে-কটা হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, ওরে বাবা, একেবারে হাড়-জ্বালিয়ে দিতে পারে ওরা!

মেহদী আলি আমার দিকে ফিরে বললো, এ সম্পর্কে সুনীলবাবুর কি মত?

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম, আমার কাছে মেয়েদের কোন জাত নেই। মেয়েরা যদি জ্বালিয়েও মারে, তাহলেও আমার কাছে, 'সে মরন স্বর্গ সমান!'

সুবিমল বললো, সুনীলটা চিরকালের পাজী!

মেহদী আলি বললো, আমার স্ত্রী জুলেখা কিন্তু সত্যি খুব ভালো মেয়ে। মাঝে মাঝে শুধু, ওর মেজাজটা একটু খারাপ হয়ে যায়—

—আপনার স্ত্রীর নাম আগে কি ছিল?

—জয়া সান্যাল?

—বামুনের মেয়ে?

—হ্যাঁ, একেবারে বামুনের জাত মেরে দিয়েছি! মেয়ের বাবা-মা কিন্তু নিজেরাই ব্যবস্থা করে আমাদের বিয়ে দিয়েছেন!

সুবিমল আলটপকা জিজ্ঞেস করে ফেললো, কাশেম কে?

মেহদী আলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। থমথমে মুখে বললো, দয়া করে এ প্রসঙ্গটা তুলবেন না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সুবিমলকে চোখের ইসারায় বারণ করে বললাম। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার···। আসলে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোনো কথা রাখা ঢাকা থাকে না, সুবিমল সেই হিসেবেই প্রশ্নটা মুখ ফস্কে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল।

আমাদের বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছে একতলার একটি ঘরে। আরাম করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শরীর ছড়িয়ে সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কেমন বুঝছিস?

আমি বললাম, ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে. এসেছি দোকানদার হয়ে জিনিসপত্র কিনতে, ভেবেছিলাম দরাদরি করার পর পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধে নিয়ে ফিরতে হবে, অথচ পাচ্ছি জামাই আদর ! কি খাওয়া-দাওয়া মাইরি ! সত্যি লজ্জা করছে।

—লজ্জা করলে পৃথিবীতে কিছু হয় না। যখন যা পাবি খেয়ে যাবি।

—কিন্তু আমাদের জন্য এত খরচ করছে ! নবাবের তো অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তোর কাছ থেকে আর কত টাকা পাবে ?

—আরে, তবুও মরা হাতি লাখ টাকা। নবাবী কায়দা তো রাখতে হবে ! রান্নাগুলো কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস !

—তা হলে এখানেই ক'দিন থেকে যাওয়া যাক !

—মন্দ কি ! নবাবের আপত্তি হবে না মনে হয় ! মেহদী আলির মা কিন্তু খুব চমৎকার, দেখলে শ্রদ্ধা হয় !

—আচ্ছা, তোর কি ধারণা. নবাব ওর বৌকে একবারও আমাদের সামনে বার করবে ?

—ছ্যাখ সুনীল,—সব জায়গায় গল্প খোঁজার চেষ্টা করিস না !

—গল্প যদি আমার পেছনে পেছনে তাড়া করে, তাহলে আমি কি করতে পারি ? আমার তো মনে হচ্ছে. নবাবের স্ত্রীর মাথার দোষ আছে।

—মোটেই না। তা হ'লে নবাবের মায়ের ব্যবহারে তা বোঝা যেত। উনি তো ছেলের বৌয়ের ওপর বেশ খুশীই মনে হলো !

—তা হ'লে ঐ কাশেম নামের কে একটা লোককে চাবুক মেরে তাড়ানোর ব্যাপারটা কি ?

—আমার কি দরকার বাবা ! এসেছি পাথরের মূর্তি কিনতে, কি করে সস্তায় পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করছি। তার ওপর বিনা পয়সায় এমন ভালো খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যাচ্ছে— ! ওসব কাশেম-টাশেমের ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি দরকার ?

এত বেশী খাওয়া হয়েছিল যে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ জড়িয়ে

আসছিল। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই কারুরই। সুবিমল আর আমি অনেকক্ষণ গল্প করতে করতে জেগে থাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কখন যে এক সময় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। এমনকি আমার জ্বলন্ত সিগারেটটা ঘুমন্ত হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল কার্পেটে। কি একটা গন্ধ পেতেই আবার ঘুম ভাঙলো, চোখ চেয়ে দেখি আমার জ্বলন্ত সিগারেটে কার্পেটের অনেকটা গোল হয়ে পুড়ছে। তাড়াতাড়ি হাতের থাবড়া দিয়ে নিভিয়ে দিলাম। ইস্ অনেকখানি পুড়ে গেছে কার্পেটটা. বেশ লজ্জা করতে লাগলো। যদিও, সেই কার্পেটটার আরও দু-এক জায়গায় ওরকম ছেঁড়া কিংবা পোড়া রয়েছে। নতুন পোড়া দাগ যাতে বুঝতে না পারা যায়, সেইজন্য আমি গড়িয়ে গিয়ে সেটার ওপর পিঠ দিয়ে শুলাম, এবং একটু বাদেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

কি একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলেই ভয় পেয়ে ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। আমার চোখের ঠিক সোজাসুজি একটা জানলা, সেই জানলার বাইরে থেকে একটি মানুষের মুখ তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছেলে, গালে সরু করে ছাঁটা দাঁড়ি, নাক চোখ বেশ তীক্ষ্ণ। যে হাতে সে জানলার শিকটা চেপে ধরে আছে, হাতখানা দেখলেই বোঝা যায় যে বেশ শক্তিশালী পুরুষ।

আমাকে জাগতে দেখেই সে চোখের ইসারায় আমাকে কাছে ডাকলো। প্রথম ঘুম ভেঙেই ওরকম একটা মুখ দেখে বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, একটু ঘুমের ঘোর কাটতেই বুঝতে পারলুম, একটা সাধারণ ছেলে, খানিকটা মিনতি মাখা চোখেই আমাকে জানলার কাছে ডাকছে।

আমি উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি ?

ছেলেটি ফিসফিস করে বললো, আপনাদের এই ঘরের ডানদিকে একটা দরজা আছে। সেই দরজাটা খুললে দেখবেন আর একটা ছোট ঘর! সেই ঘরে একটা দরজা আছে বাড়ির পেছন দিকের— সেই দরজাটা একটু খুলে দিন তো ?

—কেন ?

—আমি ভেতরে ঢুকবো।

—ভেতরে ঢুকবেন, তো সামনের গেট দিয়ে আসুন '

—সে গেট দিয়ে ঢুকতে হলে অনেক ঘুরে আসতে হবে। আপনি খুলে দিন না একটু কষ্ট করে—

—দেখুন, আমরা এ বাড়িতে অতিথি। আপনি বরং অন্যদের চেঁচিয়ে ডাকুন না।

সুবিমলেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও উঠে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার !

ছেলেটি সুবিমলের কাছে আরও বিনীত অনুরোধ করলো. দয়া করে. ডানদিকে ঘরের দরজাটা একটু খুলে দিন না ! আমার একটু বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে !

সুবিমলের উপস্থিত বুদ্ধি বেশী। আমিও বুঝতে পেরেছিলাম, সুবিমলও বুঝতে পেরেছে যে ঐ ছেলেটির নাম কাশেম। কিন্তু আমি ওকে ঢুকতে দেবো কি দেবো না—এ সম্পর্কে মনস্থির করতে পারছিলুম না। কিন্তু সুবিমল রীতিমতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, আপনি এখানে ঢুকতে চান ? কোন্ দিকে দরজা বললেন ?

ছেলেটি অধীর অনুনয়ে বললো, মেহেরবানী করে একটু আস্তে, মানে ওপরে অনেকে ঘুমুচ্ছে। তাদের জাগাতে চাই না।

সুবিমল আবার সেই রকমই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি গোপনে ঢুকতে চান ? আপনি কি এ বাড়ির লোক না বাইরের লোক।

—আমি এ বাড়িরই লোক।

—এ বাড়ির লোক হ'লে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকছেন না কেন ? আপনার নাম কি ?

সুবিমলের কৌশল বেশ কাজে লেগে গেল। ওর উঁচুগলায় কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে একজন লোক ঘরে উঁকি মেরেই জানলার ছেলেটিকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এলো জানলার কাছে। এই

সেই লোকটি, যাকে মেহদী আলি বলেছিল কাশেমকে চাবুক মেরে বিদায় করতে। লোকটি কিন্তু ছেলেটিকে তাড়া করলো না, কাছে এসে ব্যাকুল ভাবে বললো, কাশেম, কাশেম, কি করছিস? নবাব সাহেব দারুন রেগে আছে তোর ওপর।

কাশেম ঠোঁট উল্টে বললো, রাগ করেছে তো তাতে আধলা হবে আমার! দে দরজা খুলে দে।

—না শিগগির দূর হয়ে যা।

—বশীর, যদি দরজা না খুলিস তো তোকে একদিন দেখে নেবো।

—যা, যা, পাগলামি করিস না! শিগগির পালা!

—বিবিজী আমায় ডেকেছিল, আমি শুনেছি। এই লোক দুটো কে?

—এরা সাহেবের দোস্ত। ঐ শোন সাহেব আসছে!

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে সত্যি কারুর নেমে আসার আওয়াজ শোনা গেল। কাশেম টুপ করে বসে পড়লো জানলার নিচে, তারপর গুঁড়িমেরে চলে গেল বাগানের দিকে।

আমার ইচ্ছে ছিল, লোকটিকে কাশেম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করাব। কিন্তু তার আগেই মেহদী আলি এসে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই একবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো আমাদের দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করলো, বশীর, তুই এখানে কি চাস্?

বশীর সঙ্গে সঙ্গে অম্লানবদনে উত্তর দিল, বাবুরা ডাকলেন আমাকে, পানি চাইলেন।

—পানি চেয়েছেন তো আনিস নি কেন এখনো!

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দু'গ্লাস জল এনে হাজির করলো। ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়ার একটা ইচ্ছে থাকেই, আমরা দু'জনেই ঢক ঢক করে জল খেয়ে ফেললাম। আমার মনে হলো, মেহদী আলি বুঝতে পেরেছে যে, একটু আগে এখানে কাশেম এসেছিল। হয়তো ওপর থেকে তাকে দেখতে পেয়েই নেমে এসেছে। কিন্তু সে-সব

কথা কিছু উল্লেখ করলো না। সহাস্য মুখে জিজ্ঞেস করলো, ঘুমিয়ে উঠলেন বুঝি? কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

আমরা দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, না, না, অসুবিধে আর কি!

—মুখ হাত ধোবেন নিশ্চয়ই! ধুয়ে নিন তা হ'লে। চা তৈরী হচ্ছে।

আমি বললাম, কিন্তু শুনুন, চা খাবো এক সর্তে। চায়ের সঙ্গে আর কিছু না! দুপুরে যা খেয়েছি, এখনও পেট ভর্তি! তাছাড়া বিকেলে আমরা খালি চা খাই।

মেহদী আলির ঠোঁটে তখনও হাসি। বললো, জানি, কলকাতায় এখন এই সময়ে আপনারা তো চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে গল্প করেন! আমারও খুব ইচ্ছে করে—

সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, আপনি এই গ্রামে পড়ে থাকার বদলে কলকাতায় গিয়ে থাকেন না কেন?

—উপায় নেই। একদিন দু'দিনের বেশী কলকাতায় থাকতে পারি না।

—কেন?

—প্রথম কথা, কলকাতা আমার ঠিক সহ্য হয় না। কলকাতার খাবার, কলকাতার জল খেলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তা ছাড়া, আমাদের এখানে জ্ঞাতিগুষ্টি অনেক, তাদের মধ্যে এত দলাদলি, এত ষড়যন্ত্র যে বেশীদিন এখানকার বাইরে থাকলে ফিরে এসে দেখবো হয়তো আমাকে আর এখানে ঢুকতেই দিচ্ছে না!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তাইতো এখানে একা একা পড়ে থাকতে হয়। কোনো কাজকর্ম নেই বিশেষ।

সুবিমল প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলো, মৌলবী সাহেব এসেছেন? আসল জিনিসপত্রই তো এখনো দেখা হলো না!

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখানে থাকতে ভালো লাগছে না?

—না, না, খুবই ভালো লাগছে। তবে—

—মৌলবী সাহেব আসবেন কাল সকালে। মৌলবী সাহেব এলেও. আপনারা যে কাল ফিরতে পারবেন, সে আশা করবেন না।

—না, না, ফিরতেই হবে কাল।

—আকাশের অবস্থা দেখছেন? যদি সে-রকম সে-রকম বৃষ্টি নামে তিনদিনের মধ্যে ফেরার কোনো পথ থাকবে না!

—সে কি! কেন?

—মালপত্রগুলো অন্তত গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো? খুব জোর বৃষ্টি হলে এমন কাদা হয় যে, তখন এ গ্রামের রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়িও চলে না।

—ধুৎ মশাই, আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন!

—ঠিক আছে, দেখবেন! আমি তো আর আপনাদের জোর করে আটকে রাখবো না!

—আচ্ছা. সে যা হয়, দেখা যাবে! এখন বিকেলটা কি করা যায়? চলুন একটু গ্রামটা ঘুরে দেখে আসি।

মেহদী আলির মুখটা হঠাৎ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, গ্রাম দেখতে যাবেন? যান তা হ'লে, আমি সঙ্গে একজন লোক দিচ্ছি!

—আপনি যাবেন না?

—আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বংশে কেউ কখনো পায়ে হেঁটে এ গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঘোরেনি। আমাদের বাড়ির শেষ ঘোড়াটা মারা গেছে দেড় বছর আগে!

—আপনি এখনো এসব বুর্জোয়া ব্যাপার মানেন? এক সময় ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেন, এখন ঘোড়া নেই বলে বাড়িতে বসে থাকবেন?

—আমি মানতে না চাইলেও গ্রামের লোক মানবেই। তারা আমাকে দেখলে অবাক হবে, কথা না বলে দূরে সরে যাবে!

—আজকাল তো অনেক বড়ো বড়ো নবাব, রাজা-মহারাজা ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে, তারাও ভোট চাইবার জন্য পায়ে হেঁটে ঘুরছে।

—আমি তো কখনো ইলেকশনে দাঁড়াবো না।

আমি বললুম, ঠিক আছে, সঙ্গে লোক দেবার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই একটু ঘুরে আসি। হারিয়ে তো আর যাবো না।

মেহদী আলি বললো, হারালেও এ-বাড়ির গম্বুজ অনেক দূর থেকে দেখতে পাবেন। তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন তা হ'লে। আমি অপেক্ষা করবো আপনাদের জন্য।

সুবিমল আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। সুবিমল বা আমার তেমন তীব্র পল্লীপ্রীতি নেই অবশ্য, তাছাড়া রাস্তা-ঘাট এখনো কাদায় চটচটে হয়ে আছে। কিন্তু সন্ধেটা কাটাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো! আমরা সঙ্গে করে কলকাতা থেকে আনতে ভুলে গেছি, দেখতে হবে এ-গ্রামে কোথাও মালপত্র পাওয়া যায় কি না। এত ভালো ভালো সব জিনিস খাওয়া হচ্ছে, এর সঙ্গে একটু মদ্যপান না হলে হজম হবে কেন? নবাবকে তো আর মুখ ফুটে সে কথা বলা যাবে না!

সুবিমল আর আমি সেই সন্ধানেই বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা ঘুরতেই বুঝতে পারলাম ও সব পাবার কোন আশা নেই। মুসলমান প্রধান গ্রাম, সকলেই প্রায় দারুন গরীব, হাস-মুর্গী-গরু মানুষ জল কাদায় মিশে এক সঙ্গে রয়েছে, গ্রামের একটি শিশুরও স্বাস্থ্য ভালো নয়, একটি নারীর শরীরেও কোমলশ্রী নেই, বৃদ্ধদের চেহারা জীবিত প্রেতের মতন। সুবিমল আর আমি চোখাচোখি করলাম, গ্রামের অবস্থা খারাপ আমরা জানতাম। এত খারাপ ভাবিনি। অবশ্য, বর্ধমান বা হুগলীর চেয়ে মুর্শিদাবাদের গ্রামের চেহারা আরও দুর্দশা-গ্রস্ত, গোটা জেলায় সে-রকম কোনো ইণ্ডাষ্ট্রি নেই, অবলম্বন মাত্র জমি—তাও এ জেলায় সেচের কাজ প্রায় কিছুই হয়নি। দু'চার ঘর হিন্দুও রয়েছে, তারা অধিকাংশই জেলে আর তাঁতী, তাদেব অবস্থাও খারাপ—যদিও গ্রামের সবচেয়ে বড় মনোহারী দোকানটির মালিক একজন মাড়োয়ারী। একমাত্র সেই দোকানেই আমাদের ব্যবহারযোগ্য সিগারেট পাওয়া গেল।

এই গ্রামে মেহদী আলিদের প্রাসাদটি সত্যিই বিসদৃশ। গোটা গ্রামে খুঁজলে আট দশটার বেশী পাকা বাড়ি চোখে পড়ে না—তাও সামান্য ধরনের একতলা বাড়ি, এই গ্রামে অত বড় প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল কি করে?

গ্রামটায় ঘুরে আমাদের একটু মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা রাজনীতি কিংবা সমাজসেবা করতে আসিনি, কিন্তু চোখের সামনে এত মানুষের দীন হীন চেহারা দেখলে মনটা মুষড়ে যায়। এই রকম একটা জায়গায় এসে আমরা পনেরো ষোলো রকমের পদ দিয়ে আহার সারছি! এটা নিশ্চয়ই অন্যায়! এখানে আর থাকার কোনো মানে হয় না।

গ্রামের লোক আমাদের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে দেখছে। আমাদের পোশাক, চালচলন দেখলেই বোঝা যায় আমরা এখানে নবাগত। বোধহয় আমাদের মতন কেউ এখানে সচরাচর আসে না। আমাদের অবস্থা অনেকটা সিনেমা স্টারদের মতন, যে-পথ দিয়েই যাচ্ছি লোকে চোখ তুলে অনুসরণ করছে আমাদের। বাড়ির ভেতর থেকে বাচ্চা ছেলেরা দরজার কাছে ছুটে আসছে আমাদের দেখার জন্য। বোধহয় তারা পরস্পর বলাবলি করছে, ঐ ছাখ, ঐ ছাখ দুটো লোক, ওদের কি চমৎকার জামা কাপড়, ওরা চারবেলা পেটপুরে খেতে পায়—ওদের কি সুন্দর স্বাস্থ্য! হয়তো ঐ শিশুদের চোখে আমরা চিড়িয়াখানার নতুন কোনো প্রাণী।

সুবিমল বললো, চল্ এবার ফেরা যাক্! বিনা বাক্যব্যয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। এর চেয়ে চুপচাপ ঐ ভাঙা বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসে থাকাও ভালো।

যাবার সময় লক্ষ্য করিনি, ফেরার সময় দেখলুম এক জায়গায় রাস্তা থেকে নেমে মাঠের ধারে একটা হোগলার ঘর, সেখানে মাটিতেই উবু হয়ে বসে আছে পনেরো কুড়িজন লোক, কি যেন খাচ্ছে। বুঝে নিতে আমাদের দেরী হলো না, ওটা তাড়ির দোকান। একজন লোক শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে কি যেন বোঝাচ্ছে। আমাদের

দেখে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে একবার না একবার তাকালো, শুধু সেই দণ্ডায়মান লোকটি কথা থামিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে।

আমি প্রথম চিনতে পারিনি, সুবিমলই ফিসফিস করে বললো, এই সেই কাশেম!

আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠলো ভয়ে। দুপুরবেলা কাশেমকে আমরা দরজা খুলে দিইনি। আমাদের ওপর রেগে আছে কাশেম। যদি এই লোকগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা সতর্ক হয়ে উঠলো।

কাশেম এগিয়ে এসে একটু উদ্ধতভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

সুবিমল কিন্তু একটুও বিচলিত হয়নি, সিগারেট টানতে টানতে অবহেলার সঙ্গে বললো, কলকাতা থেকে। কেন?

—এমনিই জিজ্ঞেস করছি!

—কেন, রাস্তা দিয়ে যে-কেউ হাঁটলেই আপনি এসে এরকম জিজ্ঞেস করেন নাকি?

—কেন, জিজ্ঞেস করাটা কি দোষের হয়েছে নাকি?

—আগে উত্তর দিন, সবাইকে এরকম জিজ্ঞেস করেন কিনা!

সুবিমলের গলার আওয়াজে এমন একটা কঠিন ভাব ছিল যে, তাতেই বোধহয় কাশেম খানিকটা নরম হয়ে গেল। সুবিমল ওর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, কাশেমই প্রথম চোখ নামালো। এবার একটু নম্রভাবে বললো, না, এ সব পাড়াগাঁয়ে তো আপনাদের মতন লোক বেশী আসে না!

সুবিমল ফের একই রকম গলার আওয়াজে বললো, আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমরা কোথায় এসেছি।

—হ্যাঁ, আপনারা ঐ ভাঙা বাড়িতে এসেছেন। আপনারা কি মেহদী আলির বন্ধু?

হঠাৎ আমার মনে হলো, কাশেম ছেলেটা বোধহয় তেমন খারাপ

নয়। একটু তেরিয়া একরোখা ধরনের, কিন্তু সৎ। ঐ বয়েসের ছেলেদের উদ্ধত হলেই মানায়। সুবিমল ওকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। লক্ষ্য করলাম, কাশেম নবাববাড়ি না বলে বললো ভাঙা বাড়ি। আমি একটু নরমভাবে বললাম, না, আমরা নবাবের ঠিক বন্ধু নই, এমনি চেনা। আপনি দুপুরে ওবাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলেন কেন ? আপনাকে যখন ওরা নবাববাড়িতে ঢুকতে দিতে চায় না।

কাশেম বললো, ওটা আমারও বাড়ি ! আমারও ওবাড়িতে ভাগ আছে।

—আপনিও নবাব বাড়ির ছেলে ?

আমি বলতে চাইছিলাম, আপনিও নবাব বাড়ির ছেলে, অথচ তাড়ির দোকানে এসে দাঁড়িয়েছেন ? কিন্তু শেষের অংশটা আর উচ্চারণ করলাম না। কিন্তু কাশেম আমার ভঙ্গিটা বোধহয় বুঝতে পারলো। খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে বললো, নবাববাড়ি, নবাববাড়ি বলছেন কেন ? নবাবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা তো সামান্য একটা গেঁয়ো জমিদারের বাড়ি, তাও এককালে ছিল, এখন আর জমিদারও নেই ! ফাঁকা কাপ্তেনি।

—তা হ'লে আসল মালিক কে ? আপনি না মেহদী আলি ?

—মালিক ঐ মেহদীই। কিন্তু আমি ওর নানীর ছেলে, আমারও ভাগ আছে। মেহদী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—ন্যায্য ভাগ থাকলে তাড়াবে কি করে ?

কাশেম আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। একটু চেঁচিয়ে বললো, মেহেদীকে বলে দেবেন, আমাকে সে কি করে আটকায় আমি দেখে নেবো ! এখনও সে কাশেমকে চেনে না—

কাশেমের উঁচু গলা সুবিমলের পছন্দ হলো না। রীতিমতন ধমকে ও বললো, এসব কথা আমাদের বলছেন কেন ? আমরা বাইরের লোক, এসব শুনে কি করবো ?

—আপনরাই তো জিজ্ঞেস করলেন !

—মোটেই জিজ্ঞেস করিনি। আপনাদের ঝগড়ার কথা আমাদের শুনে কি লাভ? আমরা এসেছি নিজেদের কাজে।

—কি কাজে?

—তা দিয়ে আপনার দরকার? কাজটা আপনার সঙ্গে নয়।

কাশেম তীব্র চোখে তাকালো সুবিমলের দিকে। কিন্তু সুবিমলের ঠাণ্ডা দৃষ্টি আরও কঠিন। কাশেম হার মেনে গেল। বললো, ঠিক আছে। আপনারা যদি এ গ্রাম থেকে কোনো জিনিস নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, তখন আমি দেখাবো!

সুবিমল হা-হা করে হাসতে হাসতে বললো, মনে হচ্ছে আপনিই এ গ্রামটার মালিক? কেউ কোনো জিনিস কিনতে চাইলেও আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিনতে হবে?

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে দেখে, আমি দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে? কথা বেশী বললেই কথা বাড়ে। চল্ সুবিমল—

তারপর কাশেমের বাহু ছুঁয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে তো আমাদের কোনো ঝগড়া নেই ভাই। আপনার সঙ্গে মেহদী আলির কি ঝগড়া তা আপনারা বুঝবেন। আমাদের জড়াচ্ছেন কেন? চলি, অ্যাঁ?

একটু দূরে গিয়ে আমি সুবিমলকে বললাম, কাশেমকে যে অতটা চটিয়ে রাগালি, সেটা কি ভালো হলো? যদি মালপত্র নিয়ে যাবার সময় মাঝপথে গরুর গাড়ি থামায়?

সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, তুইও যেমন! আমি দেখছিলাম আমার ব্যবসার স্বার্থ। তাই ওকে যাচাই করে নিচ্ছিলাম।

—কি যাচাই করছিলি?

—ঐ যে ও বললো, ও বাড়িতে ওরও শেয়ার আছে, তাই দেখে নিলাম সেটা কতটা সত্যি। কোনো জিনিস-টিনিস কিনতে গেলে ওরও অনুমতি দরকার হয় কিনা! কিন্তু ওর গলার আওয়াজেই বুঝেছি, ওর কিছু শেয়ার থাকলেও খুব সামান্য। ছেলেটা এমনিই লম্বা চওড়া বাত ঝাড়ে।

—সুবিমল তোর সাহস আছে মাইরি!

—নতুন জায়গায় এলে কক্ষনো মিনমিন করতে নেই। প্রথমেই আপার হ্যাণ্ড নিয়ে নিতে হয়।

—আমি তোকে বলে রাখলাম সুবিমল, কাশেম আমাদের ওপর বেশ রেগে আছে। ও আবার আসবে, সহজে ছাড়বে না!

সুবিমল বেশ খুশী মনে বললো, আমিও ওকে সহজে ছাড়বো না।

আমাদের অপেক্ষায় বাড়ির সামনের প্রধান চত্বরটায় দাঁড়িয়ে ছিল মেহদী আলি। ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছিল। আমাদের দেখে বললো, ভাবলাম শেষ পর্যন্ত আপনারা বোধহয় রাস্তা হারিয়েই ফেললেন!

সুবিমল শুকনো মুখে বললো, নাঃ! ছোট্ট গ্রাম, রাস্তা তো মোটে একটা, এর আবার হারাবো কি?

সুবিমলের হঠাৎ নিরুৎসাহ ভাবের কারণ বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। মোটে সাড়ে-ছ'টা সাতটা বাজে, সামনে একটা দীর্ঘ সন্ধে পড়ে আছে! এই সন্ধেটা কাটাবার চিন্তা করছে সুবিমল। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটার আগে কোনদিন ঘুমানো অভ্যেস নেই আমাদের, কলকাতায় এতক্ষণে বন্ধুরা মিলে হুল্লোড় শুরু করতাম, এখানে এই নির্জন পাড়াগাঁয়ে এর মধ্যেই আমরা দু'জনে হাঁপিয়ে উঠেছি। মাল-ফালও পাওয়া গেল না! মেহদী আলি ছেলেটা ভালো, কিন্তু কতক্ষণ আর তার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগবে!

আবার সেই ভাঙাচুরো পথ দিয়ে ভেতরে ঢোকা। আমি একটা দেয়ালে যেই হাত রেখেছি, অমনি হুড়মুড় করে কয়েকটা ইট ভেঙে পড়লো। ইটগুলো আমার গায়েও পড়তে পারতো, কিন্তু ভয় পাবার বদলে আমি লজ্জিত হয়ে উঠলাম। আমারই জন্য তো বাড়িটা আরও একটু ভেঙে গেল! মেহদী আলি একেবারে হা-হা করে উঠলো। বললো, দেখবেন, দেখবেন, সাবধান! ইস্, আপনার গায়ে লাগেনি তো?

—না, না—

মেহদী আলি ক্রুদ্ধ চোখে দেয়ালটার দিকে তাকালো। আপন মনে বললো, এই দেয়ালটা এখানে থাকার দরকার কি?

তারপর সে সামসনের মতন উন্মত্ত ভাবে দেয়ালটা ভাঙতে লাগলো। তার প্রচণ্ড ধাক্কায় ঝরঝর করে খসে পড়তে লাগলো ইঁট সুরকি। আমি অনুভব করলুম, মেহদী আলির গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে। নিছক দুধ ঘি খাওয়া নবাব সে নয়।

সুবিমল বললো, একি, একি করছেন কি?

মুখ না ফিরিয়ে মেহদী আলি বললো, ভেঙে ফেলছি দেয়ালটা।

—নিজেই নিজের বাড়ি ভাঙছেন! ছেড়ে দিন!

মেহদী আলির হঠাৎ ওরকম উত্তেজনার কোনো কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। সুবিমল জোর করে ওর হাত না ধরলে ও বোধ হয় থামতো না।

বাকি পথটা চুপচাপ হেঁটে এলাম। অন্দর মহলে মেহদী আলি জিজ্ঞেস করলো, এখন কী করবেন?

সুবিমল নিরাসক্ত ভাবে বললো, আপনিই বলুন!

—আসুন, সুনীলবাবুর সঙ্গে একটু সাহিত্য আলোচনা করা যাক্? উনি তো লেখেন-টেখেন শুনেছি!

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাও শুনেছেন? কিন্তু আমি ঐ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে একদম ভালোবাসি না!

—তবে কি নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন?

আমি বিন্দুমাত্র চিন্তাও না করে বললাম, যা নিয়ে আলোচনা করতে সবাই ভালোবাসে।

—সেটা কি বিষয়?

—নারী।

মেহদী আলিও অনুচ্চ গলায় হাসলো। বললো, আমি আবার ও সাবজেক্টায় একদম কাঁচা! আলি, একটা প্রস্তাব করলো। চলুন, ছাদে বসে এমনিই একটু গল্প করা যাক্! আর ইয়ে, মানে, আপনারা কি হুইস্কি খান? আমার কাছে খানিকটা হুইস্কি আছে—

সুবিমল স্থান-কাল ভুলে গিয়ে মেহদী আলির পিঠে বিরাট এক চাপড় মেরে বললো, আগে বলবেন তো! আপনি মশাই সত্যি গুরুদেব লোক! এখন একটু হুইস্কি না হলে—

আর যাই হোক, মেহদী আলির পিঠে চাপড় দিয়ে কেউ কথা বলে না! এসব তার অভ্যেস নেই। সে একটু আড়ষ্ট ভাবে সরে দাঁড়ালো। মুখখানা তার লাল হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সে সামলাবার চেষ্টা করছে। একটা জিনিস আমি সকাল থেকেই লক্ষ্য করেছি, মেহদী আলি আমাদের সঙ্গে খুব সহজভাবে মেশবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের দু'একটা ব্যবহার সে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তখন তার নবাবী মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তবুও অবশ্য সে রেগে উঠছে না, প্রাণপণে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে। সুবিমলটার একদম কাণ্ডজ্ঞান নেই—কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, খেয়াল থাকে না।

আমি একটু গুরুত্ব দিয়ে বললাম, তা হলে নবাব সাহেব, চলুন ছাদে গিয়েই বসা যাক্!

মেহদী আলি এবারও নিজেকে সংযত করে নিল। ম্লানভাবে হেসে বললো, আমি নবাব সাহেব নই! আমি এমনই একজন সাধারণ মানুষ। চলুন যাওয়া যাক্। সিঁড়িটা কিন্তু ভাঙা, আপনাদের খুব সাবধানে যেতে হবে কিন্তু।

বিকেলবেলা ঘন কালো মেঘ করে এসেছিল, এখন আকাশের একটা অংশ পরিষ্কার, দিব্যি কটকটে জ্যোৎস্না উঠেছে। হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুরে। মনে হচ্ছে আমরা একটা কবরখানায় বসে আছি। চতুর্দিকে ভাঙা বাড়ির ভগ্নস্তূপ। যে ছাদটায় আমরা বসে আছি, তারও পাঁচিল অনেক জায়গায় ভাঙা। যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছি, সেটার অবস্থা এমন শোচনীয় যে সেটা দিয়ে যদি আবার ঠিকঠাক নামতে পারি, তবে নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে।

মেহদী আলি মদ খায় একেবারে জলের মতন। এক এক গ্লাস

ঢালছে আর এক চুমুকে শেষ করছে। নাটক-ফাটকে দেখা যায়, আগেকার নবাবরা সিরাজী না কি একটা মদ খুব খেতো ঢক্‌ঢক্‌ করে, মেহদী আলি তার পূর্বপুরুষদের এই গুণটা পেয়েছে। সুবিমল আমাদের বন্ধুমহলে 'তিমি মাছ' নামে প্রসিদ্ধ। এক-আধবোতল হুইস্কি তার কাছে কিছুই নয়! সে পর্যন্ত মেহদী আলির খাওয়ার বহর দেখে চমকে গেল। তারপর সুবিমল পাল্লা দিতে গেল তার সঙ্গে।

আমার বুঝতে দেরী হলো না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরা দু'জনই মাটিতে গড়াবে। অনেকেরই তো অনেক বারফাট্টাই দেখেছি। ওদের সঙ্গে অজ্ঞান হবার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। আমি অল্প অল্প ঢেলে আস্তে আস্তে চুক্‌ চুক্‌ করে খেতে লাগলাম। এক সময় সুবিমল আর মেহদী আলি কি একটা বিষয় নিয়ে তর্কে খুব জমে গেলে, আমি গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ঘুরে দেখতে লাগলাম সারা ছাদটা।

একেবারে উপরের দিকে যেতে ভয় করে। অধিকাংশ জায়গাতেই পাঁচিল ভাঙা। তা ছাড়া যে কোনো জায়গায় পা দিলেই ইট খসে পড়তে পারে। যে দিকটার পাঁচিলটা মোটামুটি অক্ষত, সেখানে সাবধানে দাঁড়ালাম।

ইলেকট্রিক নেই এ গ্রামে, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও আসবে কিনা সন্দেহ। চারদিকে জমাট অন্ধকার, জ্যোৎস্নার আলো তার সামান্যই ভেদ করতে পেরেছে। তবু আন্দাজে বোঝা গেল, এপাশে বাড়ির কাছেই একটা পুকুর। সেখানে একটা লণ্ঠনের আলো। আমি চোখ সরু করে লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, সেই লণ্ঠনটা ধরে আছে একটি মেয়েলি হাত।

আস্তে আস্তে অন্ধকার আমার চোখে সয়ে গেল। লণ্ঠনের আগে মাঝে মাঝে আমি মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। যে কেউ অনায়াসেই ভাবতে পারে, এখানে ঐ পুকুর পাড়ে একটি অলৌকিক অশরীরী মূর্তি ঘুরছে। কেননা লণ্ঠনের আলোয় একবার তার মুখ দেখা যায়,

একবার সে অদৃশ্য। তাছাড়া, মেয়েটি পুকুরের জলে নামেনি, তাকে দেখলে মনে হয়, সে যেন পুকুর পাড়ে কি খুঁজছে! কোনো গাছের শেকড়?

মাঝে মাঝে মেয়েটিকে যেটুকু দেখতে পেলাম, তাতে মনে হলো, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, একুশ-বাইশ বছরের বেশী বয়েস নয়, একটা কালো ওড়না মাথায় দিয়ে আছে। আমি চোখ দুটোকে যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল করে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করলুম। এই ভাঙা বাড়ি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, একটা কিছু সুন্দর জ্যান্ত জিনিস দেখার জন্য মন ছটফট করছিল।

এই কি জুলেখা! মেহদী আলির বউ? কিন্তু পুকুর ধারে সে কি করছে! বনেদী পরিবারের বউ একা একা রাত্তিরবেলা পুকুর ধারে ঘুরবে, এটা ঠিক আশা করা যায় না। কিন্তু তা ছাড়া আর কেই বা হবে। এত বড় বাড়িটায় আর তো কোনো জনমনুষ্য নেই। মেয়েটিকে দেখে খুব সাধারণ ঘরের মেয়েও মনে হয় না।

মেয়েটি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে? খুব সম্ভবত নয়! তবু একবার সে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করলো। এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার গন্ধরাজ ফুলের মতন তাজা মুখ। চোখ দুটো টানা টানা। হঠাৎ আমি সচেতন হয়ে গেলাম, মেয়েটি আমাকেই দেখছে! হাত তুলে কি যেন বলার চেষ্টা করলো! আমি বুঝতে পারলাম না, আমার সরে যাওয়া উচিত কিনা। কিন্তু একটু বাদেই মেয়েটি লণ্ঠনটা সরিয়ে নিল। পাঁচিলের ওপর বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকেও আমি মেয়েটিকে কিংবা লণ্ঠনটা আর দেখতে পেলাম না।

গেলাসের অবশিষ্ট পানীয় এক ঢোকে শেষ করে আমি ফিরে এলাম ওদের কাছে। মেহদী আলি আর সুবিমল তখন তর্ক থামিয়েছে। মেহদী আলি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন দেখলেন মেয়েটিকে?

আমি চমকে ওঠার বদলে ভয় পেয়ে গেলাম। কিংবা ঠিক ভয়

নয়। এই ধরনের অনুভূতিকেই ইংরাজিতে বলে, আনক্যানি। আমি বললাম, আপনি কি করে জানলেন?

মেহদী আলি সরলভাবে হেসে বললো, আমি যে ম্যাজিসিয়ান। আমি অনেক কিছু বলতে পারি। আপনি বুঝি ভাবছিলেন ও আমার বউ?

—তবে কে মেয়েটি?

—মৌলবী সাহেবের মেয়ে, সোফিয়া।

—মেয়েটি কিন্তু দারুণ সুন্দরী!

—লোকে তাই বলে। আপনিও বললেন।

সুবিমল ঈষৎ জড়িত গলায় বললে, সুনীলটা ঠিক এর মধ্যে একটা মেয়ে খুঁজে বার করেছে!

আমি সুবিমলকে অগ্রাহ্য করে মেহদী আলিকে বললুম, মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, ও যেন কি খুঁজছে।

—ঠিক! আমাকে খুঁজছিল।

—আপনাকে?

মেহদী আলি আবার হাসলো। মাতালের হাসি। বললো, সুনীলবাবু, এবার আপনার ফেভারিট সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন! নারী! আমি আবার ও সম্পর্কে কথা বলতে একদম ভালোবাসি না! সুতরাং, ঐ সাবজেক্টের এখানেই ইতি!

—ঠিক আছে। আপনি দু' একটা ম্যাজিক দেখান!

—ম্যাজিক দেখবেন? এই দেখুন!

মেহদী আলি একটা ভর্তি গ্লাস ঠোঁটের সামনে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিল। তারপর গলা একটুও না কাঁপিয়ে বললো, দেখলেন তো, ভর্তি গ্লাসটা কি রকম খালি হয়ে গেল? এটা ম্যাজিক নয়?

—ঠিক আছে। এবার খালি গ্লাসটা এমনি এমনি ভর্তি করে দিন তো!

—তাও পারি। এই দেখুন!

গ্লাসটার ওপরে একবার, আমার চোখের সামনে একবার জাদুর ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। আমি দেখলাম, সত্যি সত্যি গ্লাসটা আবার ভরে গেল। মেহদী আলি গ্লাসটা আবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো। তারপর গ্লাসটা উপুড় করে বললো, দেখলেন তো, এতে আর এক ফোঁটাও নেই। এই দেখুন! এবার?

গ্লাসটা আবার সোজা করতেই সেটা টলটলে ভরা। একটু নাড়লেই যেন উপচে পড়বে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। পি সি সরকারের ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া নামের ম্যাজিক দেখে এক সময় খুব বিস্মিত হয়েছিলুম, কিন্তু চাঁদের আলোর নিচে বসে সেই ভাঙা প্রাসাদের ছাদে মেহদী আলির ম্যাজিক আমার কাছে আরও বিস্ময়কর মনে হলো। ও কি আমাকে সম্মোহিত করেছে? কিন্তু আমি আর সবই তো ঠিকঠাক দেখছি!

মেহদী আলি বললো, এই দেখুন আর একটা! হাতের খালি গ্লাসটা মেহদী আলি মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলো। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল সেটা। পরমুহূর্তেই জাদুর একটা ভঙ্গি করে ভাঙা কাচগুলো কুড়োতে গিয়ে মেহদী আলি একটা আস্ত গ্লাস তুলে আনলো। ভাঙা কাচের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। সুবিমল বললো, হ্যাট্‌স অফ্। সত্যি মশাই ম্যাজিকের মতন ম্যাজিক! এবার আমার ফাঁকা গ্লাসটা ভরে দিন তো!

মেহদী আলি বললো, আর হবে না। আমার শক্তি চলে গেছে।

আমি বললাম, আপনি এরকম ভাঙা জিনিস ইচ্ছে করলেই জুড়তে পারেন? খালি জিনিস ভরে দিতে পারেন?

খানিকটা তেজের সঙ্গে মেহদী আলি বললো, হ্যাঁ পারি!

—তা হলে আপনাদের এই ভাঙা বাড়িটাও আপনি ম্যাজিকে সুন্দর করে দিন না।

মেহদী আলি একটু হেলান দিয়ে বসেছিল। এবার সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, কি বললেন!

—আপনি ভাঙা গ্লাসটা যদি জুড়ে দিতে পারেন, তা হলে

এই ভাঙা বাড়িটাও আবার সুন্দর রাজপ্রাসাদ করে দিতে পারেন না ম্যাজিকে!

মেহদী আলি মুখের চেহারা বদলে গেল। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলো। তীব্র স্বরে বললো, পারলেও আমি তা চাই না। আমি এই বাড়ির সম্পূর্ণ ধ্বংস দেখে যেতে চাই!

মাতালের সব কথার গুরুত্ব দিতে নেই। কিন্তু মেহদী আলির মুখ দেখে মনে হলো, সে একেবারে বুকের ভেতর থেকে কথা বলছে। সে আবার জোর দিয়ে বললো, আমি এ বাড়ির ধ্বংস দেখে যেতে চাই!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

মেহদী আলি একেবারে ফুঁসে উঠলো, কেন তাও জিজ্ঞেস করছেন? বুঝতে পারছেন না? এই যে গ্রামটা ঘুরে দেখে এলেন, কি দেখলেন? কিভাবে বেঁচে আছে লোকগুলো? একি মানুষের মতন বেঁচে থাকা? না পশুর জীবন? এদের এই অবস্থা কে করেছে জানেন? আমারই পূর্বপুরুষরা। এদের রক্ত শুষে নিয়ে আমরা এই প্রাসাদ বানিয়েছি। এই পাপের প্রাসাদ আমি ধ্বংস করে দিয়ে যাবো।

—কিন্তু, নিজের ঘর ধ্বংস না করে, ওদের উন্নতির জন্য ওদের মধ্যে গিয়ে কিছু কাজ করাই তো ভালো?

মেহদী আলির মুখটা খুব করুণ হয়ে গেল। নেশার অবস্থায় মানুষের দুঃখ, আনন্দ এ দুটোই ফোটে খুব গম্ভীর ভাবে। খানিকটা হাহাকারের মতন সে বললো, তা আমি পারবো না। আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি হচ্ছি এই সেল্‌জুক বংশের শেষ প্রতিনিধি। আমার পক্ষে ঐ গ্রামের চাষীদের সঙ্গে মেশা সম্ভব নয়। আমিও সহজ হতে পারি না, ওরাও পারে না! তা ছাড়া ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে কেন? আমার বাবা ওদের উপর চাবুক চালিয়েছে, আমাকে ওরা বিশ্বাস করতে পারে? আমি পারবো না—আমি শুধু ধ্বংস করে দিয়ে যাবো—তারপর কেউ যদি কিছু গড়তে পারে তো গড়ুক!

—কাশেম বুঝি ওদের নেতা? কাশেম তো ওদের সঙ্গে মিশতে পেরেছে!

—কাশেম? কাশেমকে আমি খুন করবো। আমি নিজের মরার আগে কাশেমকে খুন করে যাবো।

অচেনা জায়গায়, এসব খুন জখমের কথা শুনলে গা শিরশির করে। আমি আর কথা বাড়ালুম না। চুপ করে গেলাম। সুবিমল চুপ করে শুধু মদ্য পান করে যাচ্ছিল, এক সময় শুয়ে পড়লো। মেহদী আলিও আর বেশীক্ষণ টিঁকলো না, আর একটা বড় চুমুক দিয়ে আবার বিড়বিড় করে বললো, কাশেম! কাশেম! ঐ নিমকহারামটার জান না নিলে···। তারপর মেহদী আলিও শুয়ে পড়লো। আমার হাতের গ্লাসে তখনও খানিকটা পানীয় ছিল, সেটাতে চুমুক দিতে গিয়েও আমার কি মনে হলো, আমি চলাৎ করে সেটা ছুড়ে ফেলে দিলাম।

এরা তুটোই তো লটকে গেল। এখন আমি একা একা এখানে বসে কি করবো? যে-রকম ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি, অন্ধকারে সেখান দিয়ে নিজে নামার সাহস হয় না। কোনো চাকর বাকরকে ডাকবো? কিন্তু তাতে যদি মেহদী আলির সম্মানের হানি হয়! চাকরেরা ওকে এসে এই অবস্থায় দেখবে—

সুবিমলের ওপরেই বেশী রাগ হলো! কেন পাল্লা দিয়ে খেতে যাওয়া? তু' তিনবার ওকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম, সুবিমল, সুবিমল! অতিকষ্টে একবার চোখ খুললো, আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললো, আঃ, দাঁড়া না, বিরক্ত করছিস কেন?

ওকে তোলার কোনো আশা নেই দেখে আমি নিজেই সারা ছাদে পায়চারি করতে লাগলাম। পুকুরের দিকটায় উঁকি মারলাম একবার। ছিদ্রহীন অন্ধকার। যতদূর চোখ যায়—শুধু অন্ধকার —এত অন্ধকার একসঙ্গে বহুদিন দেখিনি। সারা রাতই কি ছাদে কাটাতে হবে নাকি? ওদের নেশা কখন ভাঙবে, কিছুই ঠিক নেই। আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার ভূতের ভয় নেই, কিন্তু অমন অন্ধকার রাত্তিরে ভাঙা বাড়ির ছাদে যদি আচমকা একটি রমণীমূর্তি দেখতে পাই, তাহলে ভয় পাবো না ?

মেয়েটি কখন উঠে এসেছে আমি বুঝতে পারি নি। তাই হঠাৎ মনে হলো যেন জ্যোৎস্না থেকে নেমে এসেছে কোনো অপ্সরী। গাঢ় নীল রঙের একটা শাড়ি পরে আছে, তাতে চুমকি বসানো। তার ফর্সা মুখে চোখ দুটিই যেন প্রধান—যেমন টানাটানা, তেমনি উজ্জ্বল। তার কোমরে চাবির থোকা কিংবা কোনো অলঙ্কার রয়েছে, তাই সেখান থেকে মৃদু ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে।

আমি হতচকিত ভাবে তাকিয়ে ছিলাম, মেয়েটি স্বাভাবিক ভাবেই বুকের সামনে দু'হাত জোড় করে বললো, নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমার নাম জুলেখা !

আমি একটু আড়ষ্টভাবে বললাম, ও আপনিই এ বাড়ির বেগম ! নমস্কার।

জুলেখা হাসলো, বললো, বেগম টেগম কিছু নই। এই ভাঙা বাড়ির বউ। আমার আগেকার নাম ছিল জয়া !

—জানি। শুনেছি !

—শুনেছেন ? কার কাছ থেকে শুনলেন ?

—মেহদী আলিই বলেছে !

—এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে ? আর কি বলেছে আমার সম্পর্কে ?—বলেনি, যে আমি পাগল ?

—না, তো ! সে রকম কথা কিছু বলে নি !

—আমাকে কিন্তু পাগলের মতনই আটকে রেখেছে এ বাড়িতে !

জুলেখার ব্যবহারে কোনো জড়তা নেই। কিন্তু আমার একটু অস্বস্তি লাগতে লাগলো। নিঝুম রাত, দু'জন মাতাল হয়ে গড়াচ্ছে, আর এই সময় বনেদী বাড়ির যুবতী বউ গল্প করছে আমার পাশে দাঁড়িয়ে, এই দৃশ্যটা কেমন যেন অস্বাভাবিক। জুলেখা মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয়, এ খুব বিপজ্জনক মেয়ে। এই রকম মেয়েরা

কখন কি রকম ব্যবহার করবে, তার কোনো ঠিক নেই। এই রকম মেয়েরা পুরুষদের বড় বেশী টানে। আমি তো নিজেকেও বিশ্বাস করি না— !

বললাম, মেহদী আলি আর আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে এখানে !

সাধারণ ঘুম যে নয়, তা জুলেখাও জানে। কিন্তু কোনো গুরুত্ব দিল না। অবহেলার সঙ্গে বললো, ও রকম প্রায়ই হয়। আপনি কলকাতায় কোথায় থাকেন ? ইস্, কতদিন কলকাতায় যাই না ! প্রায় পাঁচ ছ'বছর !

—কেন, যান না কেন ?

বিদ্যুতের আলোর মতন হাসলো জুলেখা। বললো, কি করে যাবো ? আমাকে যে পাগল বলে এখানে আটকে বাধা হয়েছে !

এবার আমার সত্যিই একটু ভয় করতে লাগলো। জুলেখা সত্যিই পাগল নয় তো ? সকালবেলা যে-রকম ভাবে চেঁচিয়ে কাশেমের নাম ধরে ডাক দিল, তাতে খানিকটা অস্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। যতই সুন্দরী হোক, এই রকম অবস্থায় কোনো পাগলির সঙ্গে কথা বলা মোটেই সুবিধের ব্যাপার নয় !

জুলেখা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারলো। পুনশ্চ হেসে বললো, আমি কিন্তু সত্যিই পাগল নই। আপনি ভয় পাবেন না ! আসলে পাগল হচ্ছে আমার স্বামী মেহদী আলি। সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বলে আপনারা বুঝতে পারেন নি ?

—না তো ! পাগল হবে কেন ? আমার তো মেহদী আলিকে বেশ ভালোই লেগেছে !

—আমারও ভালো লেগেছিল ! বহরমপুরে যখন ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। নবাব পরিবারের বংশধর, কিরকম সুন্দর চেহারা —কত আশা করেছিলাম, নবাব বাড়ির বউ হয়ে আসবো—কত দাস-দাসী উঠবে-বসবে আমার হুকুমে, নহবৎখানার সানাইয়ের বাজনায় সকালে ঘুম ভাঙবে। আমার তো হিস্ট্রি অনার্স ছিল, এসব কল্পনা করতে বড় ভালো লাগতো। এখানে ভাঙা ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে আমি

বন্দিনী—যে-কোনো কেরানীর বউও আমার চেয়ে সুখী। এখানে দাস-দাসী যে দু একজন আছে, তারা আমার হুকুম শোনে না!

—আপনার বুঝি মানুষকে হুকুম করার খুব শখ?

—কোন্ মেয়ের এ শখ থাকে না? বিশেষত যে মেয়ে স্বামীকে হুকুম করার সুযোগ পায় না! আমার দুঃখ কি জানেন, এখনও এদের যা আছে, তাও যদি মোটামুটি বাঁচিয়ে রাখা যেত তাহলেও খুব কম হতো না! কিন্তু মেহদী আলি চায় সব কিছু নষ্ট করতে, এমন কি ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও তেমন জোরালো নয়। ওর সঙ্গে আমিও কেন নিজেকে নষ্ট করতে যাবো? আমার তো বাঁচতেই ইচ্ছে করে! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এ বাড়িতে!

—তা আপনি অন্য কোথাও চলে গেলেই পারেন? মুসলমানদের মধ্যে তো শুনেছি, বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব সহজ ব্যাপার!

—সব সময় সোজা নয়। মেহদী আলি আমাকে এ বাড়িতে আটকে রেখেছে. আমার বেরুবার উপায় নেই। বেরিয়েই বা একা একা কোথায় যাবো?

—বাপের বাড়িতে যান না?

—ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলাম। মুসলমানকে বিয়ে করেছি স্বেচ্ছায়, আর কি বাপের বাড়ি ফেরা যায়! তাছাড়া যাবোই বা কি করে? একমাত্র কাশেমই আমার ভরসা। ঐ আর একটা পাগল!

আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠছে যদিও, কিন্তু এদের একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার শুনতে চাওয়াও উচিত নয়। তাছাড়া এখানকার ধরন-ধারণ আলাদা। কাশেম কি জুলেখাকে ভালোবাসে? এ কি ধরনের নগ্ন ভালোবাসা, কাশেম চায় তার স্বামীর কাছ থেকে জুলেখাকে কেড়ে নিতে! আর জুলেখার স্বামী তা জেনেশুনে বন্দী করে রেখেছে স্ত্রীকে! এক হিসেবে এই রকম সরল ভালোবাসাই তো স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা যে অনেক ঘোর প্যাঁচে একে জটিল করে রেখেছি।

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কাশেম বুঝি আপনাকে ভালোবাসে?

—পাগলের ভালোবাসা! এক সময় কাশেম আর মেহদী আলির কি ভাব ছিল আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না! যাকে বলে হরিহর আত্মা? কাশেম আমার সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা পেত, আমার সামনে আসতই খুব কম, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। তারপর একদিন কাশেম—আমাকে কিছু বলে নি, মেহদী আলিকেই বলেছিল, ও আমায় ভালোবাসে, আমাকে না পেলে ও মরে যাবে! তারপর শুরু হয়ে গেল তু'জনের মাবামারি। যেন আমার মতামতের কোনো মূল্যই নেই। ভেবে দেখুন! একে পাগলামি বলা উচিত নয়!

—মেহদী আলির দিক থেকে আমি তো কোনো পাগলামি দেখছি না! নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কেউ ওকথা বললে রাগ তো হবেই।

—আচ্ছা, মনে করুন, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে যদি কেউ এরকম বলতো! আপনি কি করতেন?

—আমি কি করে জানবো! আমি তো বিয়ে করিনি?

—করেন নি এখনো?

—শুনুন, রাত তো কম হয়নি, ওদের তুজনকে তোলার কি ব্যবস্থা করা যায়?

—ওরা থাক্, শুনুন! আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—কি সাহায্য?

—আপনি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন?

শুনতে বেশ রূপকথা রূপকথা লাগলো। যেন বন্দিনী রাজকন্যা পাষাণ তুর্গ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আকুতি জানাচ্ছে। রাজকন্যা না হোক, নরাবপত্নী তো বটে। কিন্তু আমি তো বিদেশী রাজপুত্র নই। আমি কলকাতা শহরের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মতন একজন মানুষ। আমার চেহারা দেখলে কেউ আমাকে কোটালপুত্রও বলবে না।

সামান্য হেসে আমি বললুম, তা কি হয়! মেহদী আলির সঙ্গে

এরকম একটা বিশ্বাসঘাতকতা করবো কি করে? মেহদী আলি আমাদের সঙ্গে সব সময় এত ভালো ব্যবহার করছে, ওর মনে কোনোরকম আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ও কোনো আঘাত পাবে না। মৌলবী সাহেবের মেয়ে ওকে ভালোবাসে। তাকে বিয়ে করে ও সুখী হবে।

—তা হয় না! তা ছাড়া আমি আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবো?

—যে-কোনো জায়গায়। আমি এখানে আর থাকতে পারছি না।

—আপনাকে এই একটু আগে প্রথম দেখলাম। ভালো করে চিনিই না! আপনাকে কি যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়?

—আপনারা তাহলে কোনো উপায়ে কাশেমের সঙ্গে আমার একটু দেখা করিয়ে দিন। আমি বুঝতে পেরেছি, কাশেম ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই। কাশেমই আমাকে একমাত্র আশ্রয় দিতে পারে!

—আমরা দু'দিনের জন্যে একটা কাজে এখানে এসেছি। আমাদের পক্ষে এ ধরনের কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।

—দেখুন, আমিও তো হিন্দু ঘরে মেয়ে ছিলাম। আপনি হিন্দু হয়ে আমাকে এইটুকু সাহায্য করবেন না?

এই প্রথম জুলেখাকে আমার একটু খারাপ লাগলো। আমি ওকে একটা নিষ্ঠুর কথা বলতে গিয়েও সামনে নিলাম। মুখের হাসিহাসি ভাবটা বজায় রেখেই বললাম, আপনি একটা মারাত্মক ভুল করছেন। আমি হিন্দু নই। কোনো আচার অনুষ্ঠান মানি না, ভগবানেও বিশ্বাস করি না। নানারকম অখাদ্য-কুখাদ্য খাই। আমি কি করে হিন্দু হবো? তাছাড়া পুরুষ মানুষ হিসেবে যদি আপনাকে সাহায্য করতে না পারি, তবে হিন্দু হয়ে আর কি সাহায্য করবো?

জুলেখা খানিকটা মুষড়ে পড়লো। দূরের অন্ধকারের দিকে

তাকিয়ে বললো, আমি জানি কাশেম কোথাও না কোথাও এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমার যাবার উপায় নেই। চার পাঁচ জন লোক বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছে। আমাকে এখানেই মরতে হবে। একটা ছেলেমেয়ে হলেও তাকে নিয়ে সান্ত্বনা পেতাম। কিন্তু তাও কোনোদিন হবে না—

—মেহেদী আলি ছেলেমেয়ে পছন্দ করে না ?

—ও কোনো সন্তান চায় না! কারণ ও যে চায়, ওর সঙ্গে সঙ্গেই এ বংশের শেষ হয়ে যাক।

—ও চায় ও-ই এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী থাকবে। এক একদিন রাত্তিরে বোতল-বোতল মদ খেয়ে পাগলের মতন চ্যাচায়। হাত দিয়ে দেয়ালের ইঁট ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে। এই বাড়িটা পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে চায়। আমি একদিন অতিষ্ঠ হয়ে পালাতে গিয়েছিলাম রাত্তিরবেলা। সেদিন কি হয়েছিল আমার দেখবেন ? এক জায়গায় দেয়ালের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে এতখানি পা কেটে গিয়েছিল।

জুলেখা শাড়িটা উঁচু করলো পায়ের ডিম পর্যন্ত। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও আমি দেখতে পেলাম, তার ডান পায়ে মস্ত বড় একটা কাটা দাগ, এখনো ভালো করে ঘা শুকোয় নি। কোনো রূপসী মেয়ের শরীরে ওরকম কোনো ক্ষত আমি কখনো দেখিনি, শরীরে কি রকম একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো।

জুলেখা তখনও শাড়িটা উঁচু করে আছে, তার মুখে কি রকম যেন রহস্য মাখানো হাসি। এসব ব্যাপার আমার অজানা নয়। আমি মুচকি হেসে বললুম, মেহেদী আলি তা হলে আপনাকে বিয়ে করেছিল কেন ? শুধু শুধু কষ্ট দেবার জন্যে ?

—না, বিয়ের সময় একরম ছিল না। তার পরেও দু' এক বছর খুব ভালো ছিল। তখন অনেক পরিকল্পনা ছিল—এ বাড়ি সারাবে, পুকুরপারের জমিতে চিনির কল বসাবে—এই সব! ওর মায়েরই তো দোষ। ওর মা একদিন গল্প করলো যে ওর বাবার কি রকম রাগ ছিল। একদিন নাকি তিনি যখন খেতে বসেছেন, তখন একজন

চাকর অসাবধানে জলের গ্লাস উল্টে দেয়। রাগের চোটে তিনি তখন ভাতের থালা ফেলে উঠে সেই মুহূর্তে চাকরটাকে চাবুক দিয়ে এমন মারতে লাগলেন যে, সে বেচারা মরেই গেল ? এইসব শোনবার পর থেকে মেহদী কি রকম যেন বদলে যায়। আস্তে আস্তে শুরু হলো এইসব পাগলামি।

আমি বললাম, আপনি যাকে পাগলামি বলছেন, আমার তো সে জন্যে শ্রদ্ধাই হচ্ছে ওকে !

জুলেখা হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললো, আপনি বিয়ে করেন নি। কিন্তু আপনি বুঝি কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন ?

—হ্যাঁ, একটি মেয়েকে ভালোবাসি ঠিকই। কিন্তু তাকে এখনো চোখে দেখি নি !

এই সময় মেহদী আলি ধড়ফড় করে উঠে বসলো, তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কে ? কে ওখানে ? কে ?

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি।

তখনও ঘোর কাটে নি, আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, কে ? কাশেম ?

—আমি সুনীল।

এবার চিনতে পারলো। লজ্জিত ভাব দেখিয়ে বললো, তাই তো —সুনীলবাবু ! ইস্, কত রাত হয়ে গেল ? চলুন—

মৌলবী সাহেবকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। ধপ্ধপে মাথার চুল, ধপ্ধপে দাড়ি, দৃষ্টিটি ভারী সহৃদয়। আলমারির চাবি খুলে সব টেনে টেনে বার করতে লাগলেন। ভেতরে সব অমূল্য সম্পদ। সুবিমল এক একটা জিনিস দেখছে আর আনন্দে ওর চোখ চকচক করছে। দুর্লভ সমস্ত পারস্য-পাণ্ডুলিপি—সোনার জল দিয়ে আঁকা ছবি, বহু রকমের হাতের লেখা কোরআন। অসংখ্য পোরসিলিনের পাত্র, জেড-এর মূর্তি, হাতির দাঁতের খাপে ভরা ছুরি।

মৌলবী সাহেব আপশোসের সঙ্গে বললেন, আজকাল এসব জিনিস এই পাড়াগাঁয় কেই-বা দেখে, কেই-বা কদর জানে। এখানে একজন মানুষও ফার্সী জানে না, এসব পুঁথি কে পড়বে বলেন? আমিও জানি না। উইয়ে ধরে নষ্ট হচ্ছে।

মৌলবী সাহেব ফোকলা দাঁতে ম্লানভাবে হাসলেন। মেহদী আলি দাঁড়িয়ে আছে পাশে, সুবিমলকে বললো, আপনার-যা-যা দরকার বেছে নিন।

মৌলবী সাহেবের ধারণা, আমরা এসেছি কোনো সরকারী মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিয়ে যান, যদি তবু শহরের পাঁচজন লোক দেখে—খানিকটা কাজ হবে। এখানে তো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

সুবিমল আর আমি চোখে চোখে কথা বলছি অনবরত। অর্থাৎ জিনিসগুলোর দাম হওয়া উচিত অনেক, কিন্তু কি রকম ভাবে দরাদরি করা হবে। প্রথম থেকেই জিনিসগুলোর প্রশংসা করার বদলে সুবিমল অনবরত বলে যাচ্ছে, এটা অবশ্য কপি—এ রকম কপি অনেক পাওয়া যায়! এগুলো আসল পোরসিলিন নয়—এটার তো কানা ভাঙা, কোনো দামই নেই।

আমি মেহদী আলিকে অন্যমনস্ক করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, এইসব জিনিস আর পুঁথিপত্র—এগুলো কি আপনার বাবা কিনেছিলেন?

মেহদী আলি বললো, সবগুলোর কথা জানি না। তবে, আমার বাবা নিরক্ষর ছিলেন, পুঁথিপত্রের শখ তাঁর থাকার কথা নয়। তবে বিলাসী লোক ছিলেন! ঐ সব প্লেটগুলো বোধ হয় তাঁরই কেনা।

সুবিমল যা জিনিসপত্র বাছলো, তাতে দু'টো গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে যায়। হাতের ধুলো ঝেড়ে সুবিমল মেহদী আলিকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, এবার বলুন, কত দাম দিতে হবে।

মেহদী আলি সবিস্ময়ে বললো, দাম আবার কি? আপনি এমনিতে নিয়ে যান!

সুবিমলও এতটা বিশ্বাস করতে পারলো না। গদগদ ভাবে হেসে বললো, না, না, এমনিতে নেবো কেন? সবগুলো আলাদা আলাদা হিসেব না করে সব মিলিয়ে একটা কিছু বলুন।

—আপনাকে একটি পয়সাও দিতে হবে না! এ বাড়ির লোক কখনো কোনো কিছু বিক্রী করতে জানে না! আপনি নিয়ে যান, আমি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

সুবিমল অত সহজে ভোলার ছেলে নয়। বললো, তা হয় না! এত জিনিস আমি নিয়ে যাবো, একটা কিছু দাম না দিলে চলবে কেন? আপনি বরং একটা টোকেন অ্যামাউণ্ট নিন। এই ধরুন, হাজার দেড়েক টাকা!

—আমি একটা পয়সাও চাই না। প্রজাদের রক্ত শোষণ করা টাকায় তো কেনা—এর দাম নেবার অধিকার আমার নেই।

—ঠিক আছে, আমি এ জিনিসগুলোর একটা লিস্ট তৈরী করছি! আপনি লিখে দিন, যে আপনি এগুলো আমাদের দান করলেন। নইলে পরে যদি কোনো গোলমাল হয়—

সব জিনিসগুলো প্যাক করে ভর্তি করা হ'লো হুটো গরুর গাড়িতে। গাড়ির জন্যও কোনো ভাড়া লাগবে না। এবারে একটা খুব বড় দাঁও মারা গেছে, সুবিমল খুব খুশী। ওর ইচ্ছে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে—ট্রেনে মালপত্রগুলো না তোলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু মেহদী আলি কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বে না আমাদের। তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরী হয়ে নিতে লাগলাম।

আজ খাওয়ার ঘরে জুলেখা এসে উপস্থিত হয়েছে। কাল রাত্রিতে যে জুলেখার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, মেহদী আলি সে কথা ভুলে গেছে। প্রথাসম্মতভাবে আমাদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল।

জুলেখা অসম্ভব রকমের গম্ভীর আজ, মুখখানা থমথমে হয়ে

আছে। ওকে দেখার পর মেহদী আলিও গম্ভীর হয়ে গেছে। নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য কথা বলছে দু'একটা। আজ খাওয়াটা ঠিক জমলো না, ভোজ্যবস্তু যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আবহাওয়াটা কি রকম অস্বস্তিকর। জুলেখা মাঝে মাঝে আমার চোখে চোখ ফেলে স্থির ভাবে তাকিয়ে থাকছে, কি যেন সে বলতে চায়—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। জুলেখাকে এখনও আমি সামান্যই চিনি। অপরিচিতা নারীর চোখের ভাষা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।

খাওয়া শেষ হবার পর নিচে এসে জামা-কাপড় পরে নিচ্ছি, হঠাৎ জুলেখা এসে হাজির হলো। চোরের মতন পা টিপে টিপে। আমরা দু'জনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম! দু'জন পুরুষ পোশাক পরছে, এ সময় কোনো নারীর প্রবেশ যথেষ্ট অসমীচীন। সুবিমল সদ্য আণ্ডারওয়্যার পরে প্যাণ্টে পা গলিয়েছেন, ছুটে গেল ঘরের কোণে। আমার গায়ে শুধু গেঞ্জি।

জুলেখা ওসব ভ্রুক্ষেপ করলো না। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনারা আমার স্বামীকে ঠকিয়ে কি কি নিলেন। সবাই ওকে ঠকায়!

সুবিমল বললো, ঠকিয়ে নেবো কেন; কি আশ্চর্য, আমরা—

জুলেখা বললো, এ সব জিনিসের অনেক দাম। আপনারা আমাকে সেই দাম দিয়ে যান!

—মেহদী আলি এগুলো আমাদের দান করেছে। আমাদের কাছে তার সই করা কাগজ আছে।

—কিন্তু ওগুলো কি আমারও সম্পত্তি নয়! একে একে আমার সব চলে যাচ্ছে, আমার আর কি থাকবে?

সুবিমল সৌজন্য দেখিয়ে বললো, ঠিক আছে মেহদী আলিকে ডাকুন! ও যদি চায়—আমি এখনও আমাদের যথাসাধ্য টাকা দিতে রাজী আছি। আমরাও বিনা পয়সায় কিছু নেবার জন্য আসিনি!

জুলেখা একবার চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে টাকার দরকার নেই। আপনারা আমাকেও নিয়ে চলুন!

সুবিমল তো আর কাল রাত্তিরের কথা শোনে নি। ও হতভম্বের মতন তাকালো একথা শুনে। জুলেখা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি এক উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ফুলে উঠছে ওর বুক। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অলীক। আমার মনে হলো, জুলেখা যেন বলতে চায়, আমরা এ বাড়ির ভালো ভালো সম্পদ নিয়ে যাচ্ছি, সেই হিসেবে কি ওকেও নিয়ে যেতে পারি না? আর সব মূল্যবান জিনিসের মতন ও-ও তো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এ বাড়িতে থেকে। কিন্তু জ্যান্ত সম্পদ বড় বিপজ্জনক, ও নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্য তো আমরা এখানে আসিনি।

জুলেখা আবার বললো, আমাকে অন্তত কাশেমের কাছে পৌঁছে দিন। গ্রামটা পার করে দিলেই—

ঠাণ্ডা ভাবে বললুম, আপনি এবার ওপরে যান। আপনাকে এ সময় এঘরে দেখলে কেউ অন্য রকম কিছু ভাববে।

জুলেখা আবার মিনতি করলো, আপনারা অন্তত থানায় একটা খবর দিয়ে দিন যে আমাকে এ বাড়িতে জোর করে আটকে রেখেছে!

সুবিমল এবার হুংকার দিয়ে উঠলো, কি! আমরা আর যাই হই, নেমোকহারাম নই! মেহদী আলি আমাদের উপকার করেছে, আর আমরা তার নামে থানায় খবর দেবো?

এই সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র উপায় তখন আমার মনে পড়লো। আমি দরজার কাছে এগিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলাম, মেহদী আলি সাহেব! মেহদী আলি সাহেব! উপর থেকে জবাব এলো। —আমি আসছি এক্ষুনি, আপনাদের হয়ে গেছে? জুলেখা আমার দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকালো, তারপরই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেহদী আলি আমাদের বিদায় জানাতে এলো প্রধান ফটক পর্যন্ত। প্রচুর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা ওর হাত চেপে ধরলাম। সুবিমল বললো, কলকাতায় গেলেই দেখা করবেন কিন্তু! মেহদী

আলি বিমর্ষভাবে বললো, কলকাতায় আবার কবে যাব ঠিক নেই। আচ্ছা, বিদায়!

নবাব বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে আমরা সামান্য কিছুদূর মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় হৈ হৈ করে একদল লোক নিয়ে কাশেম এসে চড়াও হলো। রক্তবর্ণ চোখে জিজ্ঞেস করলো, এসব মালপত্র কার হুকুমে নিয়ে যাচ্ছো?

আমি সুবিমলের দিকে তাকালাম। সুবিমলের মুখখানা চাপা রাগে গনগনে হয়ে উঠেছে। আমি তবু ওকে বললাম, মাথা গরম করিস না।

সুবিমল দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলালো। শান্তভাবে বললো, এসব মেহদী আলির সম্পত্তি, সে আমাদের দিয়েছে!

—মেহদী আলি দেবার কে? গাঁয়ের জিনিস, গাঁয়েই থাকবে!

এ গাঁয়ের জিনিস বুঝি কারো বিক্রী করার অধিকার নেই? আমাদের কাছে দলিল আছে।

—ওসব দলিল-ফলিল মানি না! আপনারা নামুন গাড়ি থেকে!

সুবিমল এবার গর্জন করে উঠলো, কেন নামবো? কার হুকুমে? আমি সুবিমলের হাত ধরে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলুম। হঠাৎ দাঙ্গা-টাঙ্গা লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সুবিমলের একটুও ভয় নেই, সে একেবারে বেপরোয়া। থানা-টানা এখান থেকে কতদূর তার ঠিক নেই। শান্তভাবে কাশেমকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। দেখুন, আমরা তো বে-আইনি কিছু করছি না!

—আগে আপনারা নামুন গাড়ি থেকে। এই বশীর, বয়েল খুলে দে!

ব্যাপার ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে আমি জোর করে সুবিমলকে গাড়ি থেকে নামালুম। শক্ত করে ধরে রইলুম ওর হাত। সুবিমল

নিজেই যাতে হঠকারীর মতন কিছু করে না ফেলে সেইজন্য আমি চোখ গরম করে কাশেমকে বললুম, আপনি ভেবেছেন কি ?

—চুপ করুন ?

—অত ধমকে কথা বলছেন কাকে ? আপনাকে আমরা ভয় পাই ?

কাশেমের সঙ্গে আরও দশ-বারো জন লোক। তাদের মধ্যে থেকে একজন দীর্ঘকায় লোক এগিয়ে এসে বললো. বাবু সাহেব, আপনারা সরে দাঁড়ান. এ জিনিস নিতে পারবেন না! গাঁয়ের জিনিস. গাঁয়েই থাকবে।

সুবিমল আবার চেঁচিয়ে উঠলো. গাঁয়ের কটা লোক এর কদর বুঝবে ?

কাশেম চেঁচিয়ে উঠলো, গাড়ি থেকে মাল বার করো !

তারপর এক দক্ষযজ্ঞ শুরু হলো। লোকগুলো সব ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনিসগুলো টেনে টেনে বার করতে লাগলো। দুর্লভ বহুমূল্য সব পাণ্ডুলিপির পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়তে লাগলো হাওয়ায়, ভাঙলো অনেক মূর্তি আর বাসন, ওরা ইচ্ছে করে জিনিসগুলো নষ্ট করতে লাগলো, পোরসিলিনের বাসনপত্র কেউ নিতে লাগলো গামছা বেঁধে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতেই পারছি, আর কিছু করার নেই। ভাঙা-চোরার দৃশ্য দেখতে আমার ভালোই লাগলো। সুবিমল ঐ সব জিনিসগুলোর মর্ম সত্যিকারের বোঝে. ভালোবাসে ঐ সব প্রাচীন শিল্পকীর্তি—পাগলের মতন ছুটে গিয়ে যতগুলো পাবে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। পারলো না প্রায় কিছুই।

লুঠতরাজ তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো মেহদী আলি। সোজা সে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাশেমের ওপর। কাশেম ছিটকে মাটিতে পড়ে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়ালো, একজন লোকের হাত থেকে বাঁশের ডাণ্ডা কেড়ে নিয়ে তুললো সেটা মেহদী আলির মাথা লক্ষ্য করে। আমি শিউরে উঠে দেখলাম, মেহদী আলির হাতে একটা লম্বা ছুরি।

বাকি লোকেরা ওদের থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। সুবিমল চেঁচিয়ে বললো, সুনীল, দেখছিস কি? শিগ্‌গির আটকা।

কাশেম লাঠিটা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে. মেহদী আলির ডান হাতে ছুরি ধরা. দু'জনেই দাঁতে দাঁত ঘষে বললো. আজ জান নিয়ে নেবো!

আমি আর সুবিমল দু'দিক থেকে এগুতে যেতেই মেহদী আলি চেঁচিয়ে উঠলো, আপনারা সরে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠলো, কাশেম লাঠিটা চালাবার আগেই মেহদী আলি সেটা ধরে ফেলেছে. এক ঝট্‌কায় ফেলে দিল লাঠিটা। ঝোঁক সামলাতে গিয়ে মেহদী আলি একটু হেলে পড়েছিল, আবার সোজা হয়ে ছুরি তুললো, কাশেম ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। একটা চাপা গর্জন করে মেহদী আলি তাকে তাড়া করলো।

রাস্তার পাশে নিচু মাঠ—সেই মাঠ ভেঙ্গে এঁকেবেঁকে ছুটছে কাশেম, তার পেছনে পেছনে ছুটছে মেহদী আলি। একটা লোকও ওদের বাধা দিতে গেল না। সবাই দুর্বোধ্য শব্দে চেঁচাতে লাগলো।

দৃশ্যটা আদিমকালের মতন! একজন নারীর জন্য লড়াই করছে দু'জন পুরুষ। কাশেমের শক্তিশালী দৃঢ় শরীর, তাকে ধরা অত সহজ নয়! মেহদী আলিকে দেখে মনে হয় তুলতুলে দেহ, কিন্তু সেও দৌড়োচ্ছে অসম্ভব দ্রুতবেগে। আমি বুঝতে পারলুম, নিজের স্ত্রীর ওপর অধিকার হারিয়েছে বলেই মেহদী আলি আর সব কিছুর উত্তরাধিকার সম্পর্কে এত উদাসীন! গ্রামের লোকজন বোধহয় ওদের ঝগড়ার কথা জানে, তাই কেউ বাধা দিতে গেল না। কেউ বোধহয় মেহদী আলিকে এর আগে গ্রামের মাঠে এরকম দৌড়োতেও দেখেনি!

ছুটতে ছুটতে অনেক দূর চলে গেছে ওরা, অসম্ভব উত্তেজনায় আমরা তাকিয়ে আছি। এখন আর আমাদের কিছু করার নেই। অত দূরে গিয়ে আমরা আর বাধা দিতেও পারবো না। নারীর জন্য এরকম ছুরি-হাতে মারামারির দৃশ্যও আমরা আগে কখনো দেখিনি,

প্রকাশ্য দিনের আলোয় এরকম হতে পারে কল্পনাও করতে পারিনি !

কাশেমের দুর্ভাগ্য, সে একবার হোঁচোট খেয়ে পড়ে গেল। যে পলাতক সে-ই হারে। মেহদী আলি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এত জোর পেয়েছে। কাশেম পড়ে যাওয়া মাত্রই মেহদী আলি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমরা দেখতে পেলাম রোদ্দুরে মেহদী আলির রক্তাক্ত ছুরি ঝলসে উঠলো তিন-চারবার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকে, ছুরিটা ফেলে দিল মাঠে। তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি।

আমি পেছন ফিরে একবার ভাঙা প্রাসাদের দিকে তাকালাম। জুলেখা এবার মুক্তি পাবে।

অলীক নগরী

শেষরাত্রি, ভোর আর সকালের মধ্যে ঠিক কতটা যে পার্থক্য তা অনুভব করেছি জীবনে ক'দিন? ভোর খুব সুন্দর, তার স্মৃতি আছে, কবিতায় বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু অধিকাংশ দিনই ঘুম ভাঙে কটকটে রোদ ওঠার পর।

খবরের কাগজ আসে সাতটা দশে, সেটা সকাল। তার একঘণ্টা আগে ভোর। তা বলে পৌনে পাঁচটা নিশ্চয়ই শেষরাত্রি; এই রকম ধারণা ছিল। হঠাৎ মধ্য সেপ্টেম্বরে একদিন অসময়ে জেগে উঠলুম। সাধারণ চোখ মেলে পাশ ফেরা নয়; চোখ একেবারে ঘুমশূন্য, কে যেন আমাকে ডেকে বললো, বাইরে এসো!

পাজামা ছেড়ে দ্রুত জাঙ্গিয়া, প্যাণ্ট, শার্ট পরে, রবারের চপ্পল পায়ে গলিয়ে ব্যস্ত ভাবে নেমে এলুম সিঁড়ি দিয়ে। যেন আমার কোন জরুরি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

পুবের আকাশে সূর্য নেই, কিন্তু লেবু-রঙের আলো ফুটে উঠেছে। তা হলে এটা শেষ রাত্রি, না ভোর? ব্রাহ্ম-মুহূর্ত বলে একটা গাল-ভরা শব্দ ছেলেবেলায় শুনেছি।

এরই মধ্যে রাস্তায় বিভিন্ন বয়েসী পুরুষ বেরিয়েছে, স্ত্রীলোকেরা আছে, টাটকা সবজিভর্তি ঠেলাগাড়ি ছুটছে প্রাণপণে। আমি না জাগলেও প্রত্যেক দিন এই সময়ের মধ্যেই শহর জেগে ওঠে? এত মানুষ! মন্দিরের মতন কাঁসর বাজিয়ে একটা ট্রাম ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমারই জন্য এই ট্রামটা এইমাত্র এখানে এলো, তাতে সন্দেহ কী? উঠে পড়লুম।

আমার পকেটে গত দিনের দু'খানা দু'টাকার লাল নোট। নতুন টাকা পয়সা নেবার কথা মনে পড়ে নি। কণ্ডাক্টর আসতেই তার দিকে বাড়িয়ে দিলুম একটি নোট, সে জিজ্ঞেস করলো, পার্ক স্ট্রিট?

কেন নিজের থেকে বললো ওই কথা? আমাকে অন্য কোনো মানুষ বলে ভুল করেছে? তা হলে আমাকে পার্ক স্ট্রিটেই যেতে হবে। কণ্ডাক্টরটির গালে মেহেদি লাগানো কমলা রঙের দাড়ি।

এত সকালে কে পার্ক স্ট্রিট যায়?

ট্রামটা এত জোর ছুটছে যেন মাঝখানে অন্য কোথাও থামবে না। এই সময়ে ফুটপাতে অনেক ফুল পড়ে থাকে।

পার্কসার্কাসের মোড়ে নেমে আমি হাঁটতে লাগলুম পুরোনো কবরখানার পাশ দিয়ে। আমি ছাড়া আর কোনো যাত্রী এখানে নামলো না কেন? ফুটপাথে লাগানো হয়েছে নতুন কয়েকটা ফুলের গাছ। একটি ভিখিরি পরিবার এরই মধ্যে কাঠের আগুনে রান্না চাপিয়েছে। খিচুড়ির গন্ধ। এত ভোরে ওরা খায়? একটি কিশোরী এক গোছা জ্যাকোরাণ্ডা ফুল ছিঁড়ে এনে দিয়ে দিল সেই ফুটন্ত খিচুড়ির মধ্যে। তার মা খলখল করে হেসে উঠলো।

কেমন স্বাদ হয় ঐ খিচুড়ির? ওর মধ্যে আরও কী কী দেয়? ভোরবেলা কবরখানার পাশের জীবন্ত মানুষরা যে এমন আনন্দে থাকে, তা তো জানতুম না!

এ পাশের ফুটপাথ দিয়ে একজন দীর্ঘকায় কালো রঙের লোক একটা সাদা রঙের লোমশ কুকুর নিয়ে যাচ্ছে চেন বেঁধে, জার্মান স্পিৎস। অন্যদিকে একজন গাউন পরা মহিলা টান-টান করে ধরে রেখেছে একটা চকচকে কালো রঙের কুকুর, ল্যাব্রাডর না, ককার স্প্যানিয়েল? দু' জাতের কুকুর পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না। তারা ফুঁসে ফুঁসে ডেকে উঠছে, মহিলা ও পুরুষটিও রাস্তার দু'পাশ থেকে চোখাচোখি করছে এক এক বার। এই স্নিগ্ধ ভোরেও তাদের চোখে ঝলসে উঠছে ক্রোধ।

আমার পাশ দিয়ে চারজন সাপুড়ে গেরুয়া কাপড় দিয়ে বাঁধা বেতের ঝুড়ি ঝুলিয়ে চলে গেল। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি আরও চারজন, তাদের মধ্যে দু'জন কিশোর প্রায়। এত সাপুড়ে একসঙ্গে?

সত্যিই এরা সাপুড়ে? ভোরবেলা সাপুড়েদের মিছিল? সারারাত এরা কোথায় থাকে?

কিছু কিছু মানুষ সটান ঘুমিয়ে আছে ফুটপাথের ওপর। তারা সবাই ভবঘুরে বলে মনে হয় না। একটি দোকানের সিঁড়িতে পেছন ফিরে শুয়ে আছে একজন, তার জুতোজোড়া বেশ দামি মনে হয়।

শুধু কিছু কাক ডাকছে, আর কোনো পাখির স্বর শুনতে পাচ্ছি না।

একটি গাছতলায় ন্যাকড়া পেতে, তার ওপর একটা ছোট বাক্স রেখে বেশ পরিপাটি ভাবে বসেছে একজন নাপিত। আমাকে দেখে সে মুচকি হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলো।

আমি নিজে দাড়ি কামাই। রাস্তার নাপিতের কাছে উবু হয়ে বসে গালটা বাড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই লোকটা পার্ক স্ট্রিটেও খদ্দের পায়?

লোকটিকে অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছিলুম, তবু সে আবার ডাকলো। যেন সে আমাকে কোন গোপন কথা বলতে চায়।

সে আঙুল তুলে গাছের ওপরটা দেখিয়ে বললো, একটা হনুমান!

এটা অশত্থ গাছ। ডগার দিকে সত্যিই একটা হনুমান বসে আছে, তার গলায় একটা হলুদ রঙের কলার। সে একটা ডাল দোলাচ্ছে।

আমিও নাপিতটির সঙ্গে হাসি বদল করলুম। এটা একটা দেখার মতন দৃশ্যই বটে!

হঠাৎ হনুমানটি তরতর করে নেমে এলো গাছ থেকে। আমি একটু ভয় পেয়ে দেয়াল সেঁটে দাঁড়ালুম। হনুমানটি ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হতে গিয়ে মাঝখানে ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় একবার দাঁড়ালো। এদিক ওদিক চেয়ে খুব জোরে ছুট লাগালো, এখন কী তীব্র তার গতি, লাফাতে লাফাতে ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে।

নাপিতটি পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে বললো, দেশলাই আছে, স্যার?

আমি লাইটারটি তার হাতে না দিয়ে মুখের সামনে জেলে দিলুম কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে। সেই ধোঁয়ার গন্ধে আমার গলাটা আনচান করলেও চা খাওয়ার আগে আমি ধূমপান করি না।

অবিকল যেন আমার মনের কথাটি বুঝতে পেরেই সে বললো, আর একটু এগিয়ে দেখুন, চা পাবেন।

তার কথার সুর শুনে মনে হয়, যেন সে আমার বাবা-ঠাকুর্দাকে ও চেনে!

কালো কুকুর সমেত গাউন পরা মহিলাটি তাড়াতাড়িতে ব্রা না পরেই বেরিয়েছে। এরকম তো হতেই পারে। ভোরবেলা কে আর সাজগোজ করে। কিন্তু মহিলাটির ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক। একটু ঝুঁকলেই তার বর্তুল স্তনদ্বয় দোলে। এখন রাঙা আলোয় তার মুখখানা রক্তিম। কালো, লম্বা লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ছে উল্টো দিকের ফুটপাথে, হীরের মতন তার চোখ দুটো জ্বলছে।

একটু দূরে, ফুলছাপ শাড়ি-পরা একটি আদিবাসী রমণী চাপা-কলে পোড়া কয়লা ধুচ্ছে। উরু পর্যন্ত ভিজে গেছে তার শাড়ি। সে আপন মনে কয়লা ধুয়েই চলেছে। ওই কয়লায় সে ক' পয়সা পাবে? লোকে বলে, পার্ক স্ট্রিটে নাকি কোটি কোটি টাকা রোজ ওড়ে?

এখন এখানে টাকা পয়সার কোনো গন্ধ নেই।

মধ্য শিক্ষা পর্ষদের মোড়টার কাছে গোল হয়ে বসেছে সেই সাপুড়েরা। গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো তাদের বাঁশিগুলো খুলছে। এই ভোরে এখানে এত সাপুড়ে বসেছে কেন?

আমার মতন আরও তিনজন লোক দাঁড়িয়ে পড়ে শুনছে তাদের বাঁশি। একজন পাঠান, তার গায়ের জামাটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা। অবশ্য সে সত্যিই পাঠান কি-না তা আমার জানার কথা নয়। তবে ওই রকমই মনে হয়। একজন প্রৌঢ় সাহেব, সম্ভবত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, একজন লুঙ্গিপরা মুসলমান, তার মাথায় একটা ডিম ভর্তি ঝুড়ি।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানটি বিড়বিড় করে বললো, ওয়েইট অা মিনিট। দে'ল ক্যাচ আ স্নেক।

এই সাহেবটি প্রত্যেক ভোরবেলা এখানে সাপ ধরা দেখতে আসে নাকি ?

উল্টোদিকে একটা বাচ্চাদের পার্ক। বাগানটিকে ঝোপ জঙ্গলও বলা যায়। ওই বাগানে সাপ আছে নাকি ? খুব খারাপ কথা। সকালবেলা আমার সাপ দেখার একটুও ইচ্ছে নেই।

সাপুড়েদের বাঁশির শব্দ ও হাতের ভঙ্গিতে আমারও মাথা দুলছিল। সাপধরা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে চাইলুম না।

পেট্রল পাম্পের ভেতর থেকে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ। শিশুটিকে দেখা যাচ্ছে না। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাশ দিয়ে ধীর মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে একটি মোষ, চকচক করছে তার কালো গা। তার শিং দুটো সাদা রং করা। ওই রংটুকু না থাকলে মনে হত, সে এইমাত্র কোনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

একটি দুটি গাড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।

ছোট একটা মরিস মাইনর গাড়ি এসে থামলো ফুটপাথ ঘেঁষে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ় নামলেন সেই গাড়ি থেকে, তার মুখ নাক অনেকটা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন। ধুতির কোঁচটা হাতে নিয়ে তিনি সাপুড়েদের বললেন, বাজাও, ভালো করে বাজাও !

যেন তিনি বিলায়েত খাঁ-র সরোদ বাজনা উপভোগ করতে এসেছেন।

পাঠানটি অকস্মাৎ মোষটির দিকে তাকিয়েই দৌড়তে শুরু করলো। কিন্তু সে মোষটিকে ধরতে গেল না, সে মিলিয়ে গেল উল্টোদিকে।

ডিমওয়ালাটি আমার কাছে, এসে বললো, বাবু, দেশলাই আছে ?

এক সকালে পরপর নাপিত ও ডিমওয়ালা একই সুরে আমার কাছে আগুন চাইছে কেন ?

আমি বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামলুম নিলামের দোকানটার

সামনে। লোহার গেট টানা, গেটের ওপাশে সিঁড়ির ওপরে একটা ব্রোঞ্জের বুদ্ধের মুণ্ডু। ভেতরে না রেখে এই মূর্তিটা সিঁড়ির ওপরে বসানোর মানে কী? প্রতিদিন দোকান খোলার সময় এটাকে সরাতে হয়। দোকানদাররা কি বুদ্ধকে পাহারাদার হিসেবে রেখে যায়?

একটা নীল রঙের বেলুন উড়তে উড়তে আসছে। নিঃসঙ্গ, দূরের যাত্রীর মতন। আজকের আকাশ মেঘলা। কেন যেন আমার ধারণা ছিল, প্রত্যেকদিনই ভোরের সময় আকাশ নীল থাকে। ওই বেলুনটা ছাড়া আর কোনো নীলের চিহ্নমাত্র নেই। কিছু মেঘ এখন সোনালী, কিছু বেশ ধূপের গন্ধ দেওয়া, নর্তকীর চুলের মতন। ঈষাণ কোণ কোন্ দিকে?

লম্বা, কালো লোকটি এবং গাউন পরা মহিলাটি এখন দুই কুকুর নিয়ে এক ফুটপাথে। দুটো কুকুরই গজরাচ্ছে। কুকুরে কুকুরের মাংস খায় না, আলাদা জাতের কুকুর সচরাচর প্রেমও করে না, তবু ওরা দেখা হলেই তেড়ে ঝগড়া করতে যায় কেন?

কুকুর নিয়ে যারা বেড়াতে বেরোয়, সাধারণত তাদের হাতে একটা ছোট লাঠি থাকে। এদের দু' জনেরই হাত শূন্য। কালো লোকটির বুকের বোতাম সব খোলা, গোরিলার মতন লোমশ বুক। কিন্তু তার ঝকমকে দুই চোখের মাঝখানে টিকোলা নাক। সে অলিমপিকের খেলোয়াড়দের মতন সুপুরুষ।

মহিলাটি তার কুকুরের চেনটা ছেড়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রঙের কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো সাদা কুকুরের ওপর। প্রবল ঘেউ ঘেউয়ের সঙ্গে উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে দুটিতে। লম্বা লোকটি কোনো বাধা দিল না। সে হাসছে। সে শিস দিয়ে বললো, মেক লাভ, নট ওয়ার!

সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে খসে পড়লো একটা দোকানের সাইনবোর্ড।

লম্বা, ঢোলা জামা পরা পাঠানটি দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরে এসে থমকে গেল। সাইনবোর্ডটি তুলে নিল যত্ন করে। তাতে আইসক্রিম

হাতে একটি বালিকার ছবি আঁকা। পাঠানটি লম্বা, লাল জিভ বার করে সেই বালিকার গালটা চেটে দিল, তারপর সাইনবোর্ডটা দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে সে ছুটলো আবার।

কুকুর তুটি ঝগড়া থামিয়ে পরস্পরের নাক শুঁকছে।

লম্বা লোকটি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট্‌স ইয়োর ফোন নাম্বার ?

সাপুড়েদের বাঁশি এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। ওরা কি এখনো সাপ ধরতে পারেনি ?

নীল বেলুনটা মাঝ রাস্তায় তুলছে।

ডোরাকাটা জাঙ্গিয়া পরা একজন চীনেম্যান বেরিয়ে এলো একটা বন্ধ রেস্তোরাঁ থেকে। অনেকখানি হাঁ করে সে মুখের মধ্যে আঙুল চালিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলো। তারপর বার করে আনলো একটা সোনার দাঁত। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে হাতেই রেখে দিল।

এবার সে একটা গান শুরু করলো। মুখে সোনার দাঁত থাকলে যে গান গাওয়া যায় না, এই সহজ ব্যাপারটা এতদিন বুঝিনি।

পাশের গাড়ি বারান্দাটায় পাশাপাশি সাতজন লোক কলাগাছের মতন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। যদিও কলাগাছের উপুড় বা চিৎ কিছু হয় না, তবু এরকমটা মনে হয়। একটু দূরে লাঠিতে জড়ানো পতাকার মতন একজন স্ত্রীলোক। তার পাশ-ফেরা মুখখানিতে ঘাম মাখা, তাঁর ঠোঁটের হাসিতে একটু একটু স্বপ্ন লেগে আছে।

সাইলেন্সার পাইপ ছাড়াই একটা গাড়ি প্রবল শব্দ করে চলে গেল। কিন্তু সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করলো না।

স্ত্রীলোকটির পাশে একজন রুখু দাড়িওয়ালা লোক উঠে বসে খড়ি দিয়ে মাটিতে অঙ্ক কষছে। আমি উঁকি দিয়ে দেখলুম, অঙ্ক নয়, ছক কাটা, সে জ্যোতিষের চর্চা করছে মন দিয়ে! তার হোমওয়ার্ক। একটা ছক শেষ করে সে আর একটা ছক আঁকলো! তার কাছেই তুটো ক্রাচ রাখা। লোকটির ডান পা, না বাঁ পা, কোনটা জখম ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যে চীনেম্যানটি সোনার দাঁত হাতে নিয়ে গান গাইতে শুরু করলো, তার কি একটা চোখ পাথরের?

একটা তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে।

একটা নয়, দুটো তালা, পেতলের।

মোষটা এই পর্যন্ত এসে গেছে। রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে গাঁ গাঁ করে ডেকে উঠলো দু' বার। ওকি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে? কেউ কি ওর শিং-এর সাদা রং ধুয়ে মুছে দিতে পারে না; তা হলে ও জঙ্গলে ফিরে যেতে পারত।

সাদা ও কালো কুকুর দুটো পাশাপাশি যাচ্ছে। ওদের মালিকেরা কোথায় গেল? অন্যদিকে আর-একজন গোলগাল লোকের সঙ্গে দুটি অ্যালসেশিয়ান, তারা এদের গ্রাহ্যই করছে না। গোলগাল লোকটির পাজামার ওপর ফতুয়া পরা। মাথায় একটাও চুল নেই। লোকটি মোষটাকে দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে লুঃ লুঃ করে উঠলো। কিন্তু তার পোষা কুকুর তার প্ররোচনা উপেক্ষা করে সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলো আপন মনে।

বেলুনটা কি উড়ে গেল একেবারে, আর দেখতে পাচ্ছি না!

রঙীন পাউডারের মতন মিহি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টিতে গা ভেজে না। বাতাসের সঙ্গে খেলা করে।

দুটি বামন অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে। আগে তাদের বালক মনে হয়েছিল। কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বেশ খর্ব মানুষ, তারা হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে এ ওর গায়ে। তাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। একজনের হাসির উত্তরে অন্য জন হেসে উঠছে আরও জোরে। ওদের হাসির একটা ভাষা আছে। সে ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু ওরা যেন একটা গোপন খুশীর বন্যা তুলে দিয়েছে! এত আনন্দ কী থেকে পাচ্ছে ওরা!

সাপুড়েদের বাঁশির সুর ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। সাপ কোনো-রকম সুর, গান, শব্দই নাকি শুনতে পায় না! ওদের এই বাঁশি

বাজানো তাহলে সাপ ধরার জন্য নয়? ওরা এখানকার মানুষদের ওই বাঁশির সুর শুনিয়ে রোজ জাগায়!

আমি এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। হঠাৎ কেন এসেছি এই রাস্তায়? শহরের শ্রেষ্ঠ অংশে। অথচ কিছুই চিনতে পারছি না। দিনের বেলা এই রাস্তাটা একেবারে অন্য রকম হয়ে যায়, সেটাই কি এর সত্য রূপ? অথবা দিনের বেলাতেই খুব অবাস্তব, অদ্ভুত সেজে থাকে নাকি?

গাউন পরা মহিলাটি ও কালো পুরুষটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল? কুকুর দুটো খেলা করছে, কালো ও সাদা, সাদা আর কালো। ঠিক যেন দুটো ঢেউ।

মাথায় কী যেন একটা লাগতেই চমকে উঠলুম।

সেই নীল বেলুনটা। কখন নেমে এসেছে, আমার গালে আর চুলে আদর করছে। তা হলে এই বেলুনটার সঙ্গেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল!

বেলুনটার গায়ে লেখা, ওয়েল কাম!

দেরি

একতলায় পর পর চারটি দোকান ঘর। দোকানের কর্মচারিদের বাড়ির মধ্যে যাওয়ার অনুমতি নেই, তাদের জন্য বাইরের দিকে একটা বাথরুম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো আমলের বাড়ি, ভেতরে একটা ঠাকুর দালান, সেখানে সারা বছর নানা রকম আবর্জনা জমে, শুধু অন্নপূর্ণা পুজোর সময় একবার সাফ সুতরো করা হয়, তখন আলো জ্বলে, মেয়েরা আলপনা দেয়। একতলায় ভেতরের দিকে আরও কয়েকটা ছোট ছোট অন্ধকার খুপরি রয়েছে, সেগুলো কিসের গুদাম কে জানে। সেইসব ঘরে কোনো মানুষ থাকে না, ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর এক সময় বেরিয়ে আসে বাইরে।

দোতলায় লম্বা টানা বারান্দা, তার পাশে পাশে ঘর। সিঁড়ির মাঝখানে জুতো খোলার জায়গা। সাদা-কালো মার্বেল পাথরের বারান্দাটায় খালি পায়ে হাঁটলে একটা মোলায়েম অনুভূতি হয়। এমন সুন্দর বারান্দাটার মাঝখানে দু বছর আগে একটা উৎকট দেয়াল উঠেছে, তাতে আবার একটা বিচ্ছিরি ক্যাটকেটে সবুজ রঙের ছোট দরজা। দুই ভাইয়ের ঝগড়ায় বাড়ি পার্টিশান হয়ে গেছে, এখন ঐ দেয়ালের দু-দিকে দু' মহল, দুই পরিবার গম্ভীর ভাববাচ্যে কথাবার্তা হয়। কিন্তু সিঁড়ি একটাই।

তিনতলায় একটি মাত্র ঘর। সামনে বড় ছাদ। নিচের চাতাল থেকে ওঠা দুটি দেবদারু গাছের মাথা ছাদের কার্নিস ছুঁয়ে আছে। ছাদের এক পাশে টবের গাছের বাগান।

ছাদের ঐ ঘরটায় মিলির জ্যাঠতুতো ভাই দেবব্রত আত্মহত্যা করেছিল। সে তখন ডাক্তারির ছাত্র, ফোর্থ ইয়ার, টেবিল টেনিসে চাম্পিয়ন ছিল, তবু কেন সে এক রাতে গলায় দড়ি দিল, সে রহস্য সে নিজের সঙ্গেই নিয়ে চলে গেছে। তারপর প্রায় দু' বছর খালি

পড়ে ছিল ঐ ঘরটা। সন্ধ্যের পর এ বাড়ির অনেকেই ছাদে আসতে ভয় পেত। এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার পর মিলি ঐ ঘর জোর করে দখল করে নিয়েছে। ছাদ আর ঐ ঘর দুই শরিকেরই এজমালি সম্পত্তি, কিন্তু দেবব্রতর পর মিলি ওখানে উঠে এলেও তার জ্যাঠামশাইরা এখনও আপত্তি করেননি। দেবব্রত খুব ভালোবাসতো মিলিকে।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ালে তিনতলার ঐ ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটে জানলা, সব জানলায় গোলাপি রঙের পর্দা, সন্ধের পর ঐ ঘর আলোয় ঝলমল করে। ঐ ঘরটি যেন স্বর্গের একটা টুকরো।

রাস্তার উল্টোদিকে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করে অতনুর। সে দু-তিনবার হেঁটে যায়, তাকায় তিনতলার ঘরটির দিকে, কোনো জানলায় মিলির রেখাচিত্র নেই। বই হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়া তৈরি করা স্বভাব মিলির, সে এখন পড়ছে না, সে একবারও জানলার কাছে দাঁড়ায় না। তা হ'লে মিলি এখন শুধু শুয়ে থাকে। কতটা অসুখ করেছে মিলির?

মিলি একটাও চিঠি লেখেনি। জ্বর হ'লে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'লে, ম্যালেরিয়া হ'লে, ফুড পয়জনিং হলেও তো চিঠি লেখা যায়। সাধারণত এইসব অসুখই তো হয় মানুষের। মেয়েদের আর একটা অসুখের নাম শুনেছে অতনু, বিকোলাই, সেটা যে ঠিক কী অসুখ, তা সে জানে না। মিলির চমৎকার স্বাস্থ্য, গত মাসেও সে অল বেঙ্গল সুইমিং কম্পিটিশনে ব্রেস্ট স্ট্রোকে সেকেণ্ড হয়েছে, মিলি প্রাণ খুলে হাসতে জানে, মিলির সঙ্গে কারুর ঝগড়া হয় না, সেই মেয়ের কোনো আজে-বাজে অসুখ হতেই পারে না।

চিঠি লেখার কি কোনো অসুবিধে আছে মিলির? কিংবা যাকে পোস্ট করতে দিয়েছে, সে চিঠিটা ফেলেনি ডাক বাক্সে? কলকাতায় এখন চিঠির বেশ গণ্ডগোল, তবু, মিলি চিঠি লিখে থাকলে সাত দিনেও তা পৌঁছোবে না অতনুর কাছে? অতনু তো চিঠি লিখেছে, তাও কি পেয়েছে মিলি? ওদের বাড়িতে কি কেউ চিঠি খুলে দেখে?

এককালে এ বাড়ির দরজাটা চোখে পড়বার মতন ছিল নিশ্চয়ই।

বিশাল, পুরু কাঠের দরজা, চার পাশে লোহার বড় বল্টু, মাঝখানটায় নানা রকম ডিজাইন। কিন্তু দরজাটা কোনো এক সময় ভেঙে যাওয়ার পর মেরামত করা হয়েছে, পুরোনো কাঠ ও নতুন কম-দামি কাঠের অসামঞ্জস্য দৃষ্টিকটু দেখায়, তলার দিকটাও এখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে।

দরজাটা খোলাই থাকে। তার বাইরে টুলের ওপর বসে থাকে একজন বুড়ো দারোয়ান। অনেককাল থেকে আছে, তাই একে ছাড়ানো হয়নি, এর মৃত্যু হলে এ বাড়িতে দারোয়ান রাখাব প্রয়োজন হবে না।

দারোয়ানটি বসে বসেই প্যাঁচার মতন চোখ উল্টে ঘুমোয়। কিন্তু তার পাশ দিয়ে কেউ গেলেই সে দেখতে পায়। দু-দিন আগে, খুব গাঢ় দুপুরবেলায় অতনু তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, মিলি দিদি-মণি আছেন? দারোয়ানটি হাই তুলে বলেছিল, কোউন দিদিমণি? মিল্লি দিদিমণি? হাঁ আছে, দিদিমণির বোখার হয়েছে।

—অসুখ হয়েছে? কী অসুখ?

—কেয়া মালুম।

মিলির অসুখের পাকা খবর শুনে অতনু বেশ নিশ্চিন্তই বোধ করেছিল। অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। অতনুর ভয় ছিল অন্য। শনিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে অতনুর পৌঁছোতে দেরি হয়েছিল ঠিক বারো মিনিট। মিলির কাছেই ছিল টিকিট। নাটক শুরু হয়ে গেছে, অতনু ভেবেছিল, মিলি তার জন্য আর অপেক্ষা না করে ঢুকে গেছে ভেতরে। গেটের লোকটির কাছে সে টিকিট রেখে যায়নি।

টিকিটের নম্বর মনে ছিল অতনুর, গেটের লোকটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে সে ঢুকে গিয়েছিল হলের মধ্যে। পাশাপাশি দুটো সীটই খালি। মিলি আসেনি, না রাগ করে ফিরে গেছে? এমনও তো হতে পারে, যে মিলিরই দেরি হচ্ছে। অতনু বসে পড়েছিল। মিলি আর এলো না। কিন্তু এতই ভালো নাটক যে অতনু উঠে যেতে পারলো না, সে পুরোটা দেখলো, মিলিকে বাদ দিয়ে।

তারপরেই তার সাঙ্ঘাতিক এক অপরাধ বোধ জাগলো। সে বারো মিনিট দেরি করে এসেছে, মিলি হয়তো আরও আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল। নাটক শুরু হয়ে যাবার পর। সে একা দেখতে চায়নি বলে ফিরে গেছে, আর অতনু স্বার্থপরের মতন…

সেই রাতেই মিলির কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো উপায় নেই। পরদিন সকাল ছ'টা দশের ট্রেনে অতনুর জামসেদপুর যাবার কথা। মিলি জানে, অফিসের কাজে যেতেই হবে অতনুকে। সেদিন যেতে যেতে অতনুর মনে হয়েছিল, ট্রেনের কামরায় আর একটিও মানুষ নেই, জানলায় বাইরের পৃথিবীটা সাদা রঙের। বাতাসে মিলির অভিমান।

বর্ষাকালে মিলির সঙ্গে একদিন ট্রেনে চেপে কোলাঘাটে বেড়াতে যাবার কথা আছে। এখনও বর্ষা নামেনি। যে-মানুষ থিয়েটার দেখতে বারো মিনিট দেরি করে আসে, তার সঙ্গে কি আর কোনোদিন কোথাও যেতে রাজি হবে মিলি? দু'দিন বাদে জামসেদপুর থেকে ফিরে এসে মিলির খোঁজে সে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে, কফি হাউসে গিয়েছিল। মিলির বন্ধু-বান্ধবীদের সে দেখতে পেয়েছে. মিলি ছিল না। মিলির কথা কেউ জানে না।

ভালোবাসার মধ্যে সন্দেহ, ঈর্ষা, আশঙ্কা, ভুল বোঝাবুঝি এ রকম কত কাঁটা যে থাকে। অতনুর মনে হয়েছিল, এমনই রাগ হয়েছে মিলির যে সে অতনুর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। অতনুর সঙ্গে মিলির আর দেখা হবে না!

একবার এ রকম সন্দেহ জাগলে জিভটা তেতো হয়ে যায়, সিগারেটে স্বাদ থাকে না। বইয়ের পাতায় চোখ থাকলেও মন থাকে না, স্নানের ঘরে দশ মিনিট শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কেউ কোনো কাজের কথা বলতে এলে কান বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং মিলির অসুখের খবর শুনলে অতনুর খুশি হবার কথা। এ তো সাময়িক বিচ্ছেদ। মিলি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না, মিলির চিঠি লেখার নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধে আছে। মিলিদের বাড়ির ওপরে কখনো যায়নি অতনু। মিলি আসতে বলেনি। মিলি

তার মা সম্পর্কে অনেক কথা বলে, কিন্তু বাবা সম্পর্কে না। মিলির ভাই নেই, দুই দিদি জামাইবাবু, তার মধ্যে এক জামাইবাবু সম্পর্কে অনেক গল্প, অন্যজনের নামও উল্লেখ করে না একবারও. এইসব কিছুর মধ্যে একটা অজানা গল্প আছে নিশ্চিত। তার এক জ্যাঠতুতো বোন সব সময় হিংসে করে তাকে। জ্যাঠামশাই এক সময় খুব ভালোবাসতেন মিলিকে। কিন্তু দেবব্রতর মৃত্যুর পর তিনি আর কারুর সঙ্গেই কথা বলেন না। বাড়ি পার্টিশান হয়েছে জ্যাঠাইমার উদ্যোগে।

মিলির কাছে যেতে হবে. মিলির কাছে যেতে হবে।

এটা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার? ঐ বুড়ো দারোয়ানের কাছে, কিংবা ও বাড়ির যে-কোনো লোকের কাছে গিয়ে বললেই তো হয়, আমি মিলির বন্ধু, আমি একবার মিলির সঙ্গে দেখা করতে চাই। নিশ্চয়ই তাতে কেউ আপত্তি করবে না।

কিন্তু এমন একটা সহজ কাজও অতনু সেনগুপ্তর পক্ষে দুঃসাধ্যতম। লাজুকতা তো পৃথিবী থেকে উঠে গেছে। একটি চব্বিশ বছরের, যুবক, পড়াশুনো শেষ করে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, তার কি লাজুক হলে চলে? যে-কেউ শুনে হাসবে. মিলির অসুখ হয়েছে, অতনু তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে?

আমি মিলির বন্ধু. আমি একবার মিলির সঙ্গে দেখা করতে চাই, এই কথাটা মুখ ফুটে বলার মতন সাহস কিছুতেই মনে আনতে পারে না অতনু। মিলি তার বাড়ির কারুর সঙ্গে এ পর্যন্ত পরিচয় করিয়ে দেয়নি, যদি কেউ অতনুকে দেখে ভুরু কুঁচকোয়? যদি বুড়ো দারোয়ানটি বলে, হুকুম নেহি!

যারা কোনো রকম প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারে না, তারাই তো লাজুক হয় বেশি।

অতনুর যদি হঠাৎ অসুখ হতো, তা হলে মিলি নিশ্চিত তাদের বাড়িতে দেখা করতে যেত। অতনুও তিনতলার ঘরে থাকে, কারুকে কিছু না বলে মিলি সোজা উঠে যেত তিনতলায়। মিলি মাঝে মাঝে

অতনুকে বলে, আমার বদলে তোমারই মেয়ে হওয়া উচিত ছিল! মিলি একথাও বলে, পুরুষ মানুষদের লজ্জা দেখতে আমার ভালো লাগে। চারদিকে এত সব নির্লজ্জ, বেহায়াদের ভিড়!

থিয়েটার দেখার দিন অতনু বারো মিনিট দেরি করেছিল, আর এখন সে সাত দিন দেরি করে ফেলছে। মিলি নিশ্চয়ই প্রত্যেকবেলাই ভাবছে, এই অতনু এলো, এই অতনু এলো!

মিলিদের বাড়ি বড় রাস্তার ওপরে, পাশ দিয়ে একটা গলি। সেই গলি দিয়ে পেছনে একটা খেলার মাঠ। এখান থেকেও মিলিদের বাড়ির ছাদ দেখতে পাওয়া যায়। দুটি সতৃষ্ণ চোখ সেই ছাদের দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে মিলির কোনো চিহ্ন নেই।

ছাদ থেকে দুটি মোটামোটা জলের পাইপ নেমেছে তাতে কাঁটাতার জড়ানো। কারুর কাছ থেকে অনুমতি চাওয়ার বদলে, সন্ধের পর ঐ পাইপ বেয়ে ওঠা অতনুর পক্ষে সহজ।

যা সহজ, তাও করা যায় না সব সময়। মিলি জিজ্ঞেস করবে, তুমি কী করে এলে? অতনু উত্তর দেবে, আমি পাইপ বেয়ে উঠেছি! যাঃ, সে কী হিন্দী সিনেমার নায়ক নাকি?

মিলির কাছে যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, মিলির কাছে একবার যেতে হবে।

অফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে একবার এই রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায় অতনু। দারোয়ানের টুলটা খালি, সে কোথায় যেন গেছে। কোনো চিন্তা না করে অতনু ঢুকে পড়লো ভেতরে।

একতলার বারান্দাটা অন্ধকার মত আর ঠাণ্ডা। ওপর থেকে একটা পাখির বাসা ভেঙে পড়েছে, কিচির মিচির করছে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি। গোটা বাড়িতে আর কোনো শব্দ নেই। অতনু জানে, সকাল ন'টা দশটায় কিংবা বিকেল পাঁচটা ছ'টায় এ রকমভাবে ঢুকে পড়লেও খুব বিসদৃশ দেখাতো না। ঐ রকম সময়ে লোকে দেখা করতে আসে। কিন্তু এখন দুপুর পৌনে তিনটে। এখন হঠাৎ কেউ তাকে দেখতে পেলে চোর ভাবতে পারে। আমি মিলির বন্ধু, একথা

শুনলে ভাববে বন্ধু নয়, লম্পট! কিন্তু সকালে বা বিকেলের ভদ্র সময়ে অতনু আসতে পারে না, তখন মিলির ঘরে নিশ্চয়ই অন্য লোক থাকবে, তাদের সামনে অতনু একটাও কথা বলতে পারবে না। সে পারে না। মিলির অন্য বন্ধুদের সামনেও সে সহজ হতে পারে না। অতনু সেনগুপ্ত এই রকমই, তো কী করা যাবে?

ঠাকুর দালানের পাশ দিয়েই সিঁড়ি। সিঁড়ির মাঝখানে একটা দরজা। দুপুরবেলা ওরা এই দরজাটা বন্ধ করে রাখে। বুড়ো দারোয়ানকে বিশ্বাস নেই! তাহলে অতনুকে ফিরতে হবে। বন্ধ দরজা খোলার জন্য সে তো কারুকে ডাকাডাকি করতে পারবে না।

অতনু তক্ষুনি ফিরে না গিয়ে ঠাকুর দালানের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলো। যদি কেউ সিঁড়ির দরজা খুলে নেমে আসে, এখানে লুকোবার অনেক জায়গা আছে। মিলিদের বাড়ির মধ্যে এসেছে, তার মানেই যেন মিলির অনেকটা কাছাকাছি এসেছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেও কেউ নেমে এলো না। তখন অতনুর মনে হলো, এমনও তো হতে পারে, সিঁড়ির ঐ দরজাটা শুধু ভেজানো, আজ কেউ বন্ধ করতে ভুলে গেছে। একবার দেখতে দোষ কী?

পা টিপে টিপে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। আস্তে ঠেললো দরজাটা। সত্যি সেটা খোলা। এই দরজার পাশে অনেক জুতো। দেয়ালে জুতোর র‍্যাক। অতনু শু খুললো, মোজা পরা রইলো পায়ে। এতে পায়ের আওয়াজ কম হবে। চোরেরা কি পায়ে মোজা পরে আসে? প্রথম মহলটা মিলির জ্যাঠামশাইদের, অতনু তা জানে। কে আসছে, যাচ্ছে, ওঁরা কি নজর রাখেন? যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কে? অতনু কী উত্তর দেবে? পেছনে ফিরে দৌড়ে পালাবে?

সিঁড়ির মুখটায় বেশ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অতনু। তার বুকের মধ্যে একটা ইঞ্জিন চলছে। কিন্তু তার উপায় নেই, সে আর ফিরে যেতে পারবে না।

এখানে কোথাও পায়রার বাসা আছে, শোনা যাচ্ছে শুধু পায়রাদের ঝটপটানি, মৃদু বকম বকম, কোনো মানুষের শব্দ নেই।

• অতনু নিজের মনে মনে দু-বার বললো, আমি অতনু সেনগুপ্ত, আমি চোর নই, আমি খারাপ লোক নই, আমায় ভুল বুঝবেন না।

তারপর সে আস্তেও নয়, জোরে নয়, স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে লাগল সাদা-কালো পাথরের বারান্দা দিয়ে। একটা ঘরে মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, এক নারী ও এক পুরুষ, কিন্তু তারা বারান্দার দিকে চেয়ে নেই। ওরা যদি বেরিয়ে আসে, অতনু বলবে, আমি ডাক্তার। আমি মিলিকে দেখতে এসেছি। ডাক্তাররা অসময়ে আসতে পারে। তারা ঘোর দুপুরে আসে, তারা মাঝরাতে আসে।

মনে মনে এই রকম কৈফিয়ত তৈরি করা অতনুর পক্ষে সহজ। কেউ বেরিয়ে এলো না। দুই মহলের মাঝখানে দেওয়াল ও সবুজ দরজা। এ দরজা বন্ধ থাকবে নির্ঘাত। এখানে ডাক্তার পরিচয় দেওয়াও চলবে না। মিলির জ্যাঠামশাইদের বাড়ির লোকেরা মিলিদের ডাক্তারকে চিনতে নাও পারেন, কিন্তু মিলির বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিনবে! রাস্তা থেকে একটা ডাক্তার তো এমনি এমনি মিলিকে দেখতে আসতে পারে না।

আমি মিলির বন্ধু ও ডাক্তার···মিলির অসুখ হয়েছে শুনে··· হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে···অন্য সময় সময় পাই না···

কী আশ্চর্য, এই দরজাটাও খোলা। দুই শরিকে ঝগড়া, তবু দরজাটা খোলা থাকে কেন? কেউ যেন অতনুর জন্যই খুলে রেখেছে। মিলির বাবা এই সময় নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকবেন না। আজ ছুটির দিন নয়। তবে তিনি রিটায়ার করেছেন কিনা, তা মিলি বলেনি। তার বাবা বেঁচে আছেন, তবু বাবা সম্পর্কে সে নীরব। দুই জামাইবাবুর পক্ষে এই সময় উপস্থিত থাকা খুবই অস্বাভাবিক। মা ছাড়া আর কে কে আছেন বাড়িতে?

কাছেই পরিষ্কার পুরুষ কণ্ঠ। রাগারাগি করছে যেন কার সঙ্গে। বেশ জোরে জোরে। এবার অতনু ধরা পড়ে যাবেই। এখন যে-যাই বলুক, মিলির সঙ্গে অন্তত এক পলক দেখা না করে সে কিছুতেই ফিরবে না।

ওটা রেডিওর নাটক। পুরুষ কণ্ঠের রাগারাগির পর নারী কণ্ঠের কান্না, সেই সঙ্গে সেতারের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক। একজন কেউ জেগে জেগে রেডিও শুনছে।

বারান্দা আরও অনেকটা চলে গেলেও ছাদের সিঁড়িটা একেবারে পাশেই। সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে অতনু সেই সিঁড়িতে পা দিল। যে কথাটা মিলিকে এতদিন বলা হয়নি, সেটা আজ বলতে হবে। মিলি, তুমি আমার হও। আর দূরে দূরে থাকা যাচ্ছে না। তোমার এম-এ পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। তুমি পরের বছর প্রাইভেটে এম-এ দিও!

অসুখের সময় মিলিকে কি একলা রেখেছে, এ ঘরে অন্য কেউ শোয় তার সঙ্গে। মিলির মা? কোনো বয়স্কা দাসী? অতনুর মুখখানা কাতর হয়ে এলো, মনে মনে বলল, না, প্লিজ, এতদূর আসবার পর এখন মিলির ঘরে আর কারুর থাকার দরকার তো নেই! বিশেষত মিলির মা থাকলে সে মরমে মরে যাবে।

ছাদের টবের গাছগুলোতে অনেকদিন কেউ জল দেয়নি। এই গরমে গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। মিলির ওপরেই বোধহয় জল দেওয়ার ভার ছিল। মিলি একটা ঝারি নিয়ে ফুলের গাছে জল দেবে সেই অবস্থায় মিলিকে একদিন দেখতে চায় অতনু।

মিলির ঘরের দরজা খোলা, সেখানে ঝুলছে পর্দা। ঠিক চোরেই মতন, পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে আগে দেখে নিল অতনু, না। মেঝেতে কেউ শুয়ে নেই, চেয়ারে কেউ বসে নেই, খাটের ওপর একটাই শরীর।

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে অতনু তিনবার ডাকলো, মিলি, মিলি, মিলি!

মিলি জাগলো না। অতনু কি ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকবে? হঠাৎ যদি মিলি ভয় পেয়ে যায়? চেঁচিয়ে ওঠে?

তবু আস্তে করে মিলির কপালে হাত রাখলো অতনু। তবু মিলির কোনো সাড়া নেই। মিলি কি ঘুমিয়ে আছে, না অজ্ঞান?

কিংবা তাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে ? তা হলে তো ওকে জাগানো ঠিক নয়। মিলি জানতে পারবে না যে অতনু এসেছিল ?

অতনুর বুক কাঁপতে লাগলো। এমন দুর্বল বোধ হচ্ছে, যেন সে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। এতক্ষণ সে প্রাণপণে তার মনের সমস্ত জোর একাগ্র করে ছিল, এখন যেন সব নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সে জানে, এই অবস্থায় ফিরে যাবার সময় সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে! সবাই তাকে অপমান করবে। মিলি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে আছে, সে জাগে নি। তবু তার ঘরে ঢুকেছিল কোন্ বদমাশ!

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মিলি। বালিশে ছড়ানো তার গুচ্ছ চুল। হলুদ রঙের শাড়ি পরা। একটু একটু কাঁপছে তার বুক। এই মিলি তার নিজস্ব।

কয়েক পলক চুপ করে রইলো অতনু। মিলি যেন সেই রূপকথার রাজকন্যা। সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি অদল-বদল না করলে তার চেতনা ফিরবে না। কোথায় সেই সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি!

মিলির মাথার কাছে ছোট টেবিলে টিক টিক করছে একটি ঘড়ি। অতনু ঘড়িটা তুলে নিয়ে মিলির পায়ের কাছে রাখলো। কিছুই হলো না। মিলির পায়ের কাছে একটা জাপানি হাতপাখা, খুব সম্ভবত লোডশেডিং-এর জন্য। সেটা তুলে নিয়ে অতনু রাখলো মিলির মাথার কাছে। আর কিছু নেই।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা বই। ঘুমোবার আগে মিলি পড়ছিল নিশ্চয়ই। বইটা তুলে নিয়ে দেখলো অতনু। রাইনের মারিয়া রিল্‌কের কবিতা সংগ্রহ। মিলির প্রিয় কবি। বইটা বন্ধ করে সে মিলির বুকের কাছে রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে মিলি চোখ মেললো! প্রথমে একটুখানি, আস্তে আস্তে পুরোপুরি। অতনুকে দেখে সে একটুও অবাক হলো না! সে খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললো, তুমি এসেছো? এত দেরি করলে?

অতনু বললো, হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল। তোমার কী হয়েছে মিলি ?

মিলি বললো, আমার সারা গায়ে খুব ব্যথা। সেদিন তুমি থিয়েটারে আসতে দেরি করলে, তখনই আমার জ্বর এসে গেল, তারপর থেকেই খুব ব্যথা। তুমি আর কখনো দেরি করো না।

অতনু বললো, না, আর দেরি হবে না। কিসের ব্যথা তোমার, ডাক্তার কী বলছেন ?

মিলি বললো, জানি না। কোনো ওষুধ খেয়েও সারছে না। শরীরের সব জায়গায়, প্রতিটি ইঞ্চিতে ব্যথা ! আঃ ভীষণ ব্যথা ! অতনু, আমি কি মরে যাবো ?

অতনু বললো, না, এমন বলতে নেই, তোমার ব্যথা কমে যাবে।

মিলি বললো, তুমি কী করে জানলে ? তুমি কি ডাক্তার ?

অতনু বললো, এবার তুমি সেরে উঠবে। আমি আর দেরি করবো না। তোমার শরীরে সাত লক্ষ চুমু খাবো, প্রতিটি ইঞ্চিতে, তা হলে সব ব্যথা কমে যাবে।

মিলি এবার হাসলো। অতনুর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো, তুমি পারবে ? দাও, আমার ব্যথা কমিয়ে দাও।

অতনু মিলির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, তার পায়ের পাতার ওপর থেকে শাড়ি সরিয়ে দিয়ে বললো, এইখান থেকে শুরু করি ?

মিলি বললো, ঠিক গুনে গুনে সাত লক্ষটা চাই কিন্তু, একটাও কম হলে চলবে না !